কালো টাকা

বরুণ [illegible]



কালো টাকা

বরুণ সেন

বর্ণালী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

রচনাকাল : ডিসেম্বর ১৯৫৪ হইতে এপ্রিল ১৯৫৫

প্রকাশকাল : জুন, ১৯৫৫

প্রকাশক :
কান্তিরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

দাম : দশ টাকা

উৎসর্গ

যারা কালো টাকার ভয়াল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে চান

তাঁদের মহৎ ও সৎ চিন্তার উদ্দেশ্যে—

এই লেখকের অন্যান্য বই :

চট্টগ্রাম '৭১'

গরিবী হটাও

আমরা কোথায় চলেছি

এখন আমি সব সময় আমার অতীতটাকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। আমার অতীত বলতে, দীর্ঘ এই আঠাশ বছরের জীবনের দিনগুলোকে নয়; ক'মাস আগের দেড়টা বছরকে। যে দেড় বছরের পাঁচশো সাতচল্লিশটা দিন আমি বন্দী ছিলাম। ঠিক আটচল্লিশ দিনের মাথায় মুক্তি পেলাম আমি। জেলখানা থেকে ভাগিয়ে দিলে আমাকে।

অথচ আমি জানি না আমাকে কেন ধরা হয়েছিল। জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করেছিলাম বলে আমার মনে পড়েনি। তবে, আমাকে নাকি মিসায় আটক করা হয়েছিল। কেন? যারা আমাকে আটক করেছিল তারাই সঠিক বলতে পারে। অবশ্য আমার বিরুদ্ধে নাকি অনেকগুলি অভিযোগ ছিল। যদিও তার কিছুই আমার জানা ছিল না। বোধ হয়, আমার জানার কথা নয় বলেই আমি জানতে পারিনি। আর আমাকে ধরা হয়েছিল, আমি ধরিনি।

সেদিনটার কথা আমার মনে আছে। তিয়াত্তর সাল। মার্চের শেষ। ক'দিন আগেই দোল গেছে। ঠাণ্ডা শেষ। দিনে বেশ গরম লাগে। রাতে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। জানলা বন্ধ করে রাতে পাখা চালান চলে বেশ। কিন্তু বাবার অবর্তমানে আমাদের বাড়ির কর্তা, মেজদা, বড়দা ক'বছর আগে মারা গেছে, এক ছেলে বাবার অফিসেই চাকরী করে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে; সংসারের কর্ত্রী বড় বউদি—বৈশাখ না পড়া পর্যন্ত পাখা চালাতে দেয় না। কারণ সময়টা খারাপ!

সেজদা টাটায় চাকরী করে। একলা মানুষ, বিয়ে করেনি। নদার বছর খানেক হল বিয়ে হয়েছে। মেজদার এক মেয়েরও বিয়ে হয়েছিল ওই সঙ্গে। আর একটা মেয়ে ছোট। বছর দশেক বয়েস।

সে দিনটা বড় সুন্দর ছিল। ঝক্-ঝকে উজ্জ্বল। সকালে ঘুম ভাঙার পরই মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল। একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছিলাম সে রাতে।

পর পর তিনবার চা খেয়েছিলাম সেদিন। মেজদার মেয়ে ললনা ছুটো

টাকা চাইতে এক কথায় দিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের অফিসের বড়বাবু, মেজদা, যখন অফিস বেরুলো তখনও আমি স্নান করিনি। বড় বউদির কথাটা একবার কানে এসেছিল, 'ও বোধ হয় বেরুবে না আজ!' কিন্তু তার পরই আমি স্নান খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। অফিস যাইনি। সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিলাম বাণীর স্কুলে। প্রস্তাব শুনে স্কুল থেকে ছুটি করে বেরিয়ে পড়েছিল আমার সঙ্গে। চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম আমরা। ইভনিং শোয়ে সিনেমায়। অন্ধকার হলে দুষ্টুমি করেছিলাম আমি। বিরক্ত হয়েছিল বাণী। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি হয়েছে তোমার আজ, বলতো?'

বলতে পারিনি। সবকথা কি বলা যায়! যায় না। আমিও পারিনি। আমার শুধু সেদিন অনেক কিছুই ইচ্ছা হয়েছিল। চিড়িয়াখানাতেও বাণীর প্রতি আমার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছিল। ও তখন মেনে নিয়েছিল আমাকে।

শো' শেষ হতে বাইরে কিছু খেয়েছিলাম আমরা। ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম। চলে আসছি, ও আমাকে ডেকেছিল। দাঁড়িয়েছিলাম। ও কাছে এসে বলেছিল, 'এ্যাই!'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

ও বলেছিল, 'শোন, পরশু রবিবার সকাল সকাল তুমি চলে আসবে। আমরা এক জায়গায় যাব।'

—'কোথায়?'

—'সেটা এখন বলবো না।'

—'আচ্ছা।'

—'আচ্ছা নয়, ঠিক আসবে। অনেক দূরে যাব। সারাদিন।... না, শোন, তোমার এসে কাজ নেই। আমিই যাব তোমাদের বাড়ি। ঠিক আটটা সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাব। আমার কথা মনে রেখে দয়া করে একটু সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠো। গিয়ে যেন না দেখি, বালিশ আঁকড়ে পড়ে আছো।'

—'যদি দেখো।'

—'না-না, ওসব চলবে না। বেলা পর্যন্ত ঘুমানো ভাল নয়। তোমাকে কি করে জব্দ করবো আমি জানি। বুঝলে!'

বলেই বাণী আমার মাথার চুলটা এলোমেলো করে দিয়েছিল। একটা

মধুর স্বপ্ন বুকে বয়ে আমি ফিরে আসছিলাম।…রবিবার সকালে বাণীর ডাকা হয়নি আমাকে। আমাদের গলির মোড়ে ওরা আমাকে জাল ঘেরা কালো ভ্যানটায় জোর করে তুলে নিল। এখনও মনে আছে, পেছনে একটা আঘাতও পেয়েছিলাম।

তারপর কি হয়েছিল আমার মনে নেই। মনে করতে চাইনাও আমি। কিন্তু, কেন আমাকে ধরা হল, দেড় বছর জেলে আটক রইলাম, জানি না। দোষ যখন কিছু করিনি, নিজেকে নির্দোষী বলতেও লজ্জা করে।

শুনেছি, ১৯৭১-৭৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে সারা ভারতবর্ষে আটক করা হয়েছে ১৬৮২৫ জনকে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আটকের সংখ্যা ১১১৯৯। ৩০.৬ ৭৪ তারিখ পর্যন্ত সারা ভারতে ৩৮২৯ জনকে রাজনৈতিক কারণে মিসায় আটক রাখা হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা হল, ৩২৬৬ জন। ওই সময়ে সারা ভারতে চোরাকারবারীও অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধীদের আটকের সংখ্যা ৪৭৪ জন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা নাকি মাত্র ৩৭। অথচ চোরাকারবারীদের লীলাভূমি এই পশ্চিমবঙ্গ!

আমাকে কেন ধরা হয়েছিল আমি জানি না। অথচ ধরার কারণ হিসাবে অভিযোগের অন্ত ছিল না আমার বিরুদ্ধে। যদিও তার কোন একটার সঙ্গেও আমি জড়িত নয়। আমকে জড়ানো হয়েছিল। কেন, সেটাই আমি বুঝতে পারি না। কোন উদ্দেশ্যে—তাও আমার বুদ্ধির অগম্য।

আমাকে ছাড়ানোর ব্যাপারে অনেক অর্থব্যয় হয়েছে। আমার দাদাদের অনেক ছোটাছুটি করা হয়েছে। আমি মুক্তি পেয়েছি দীর্ঘ দেড় বছর পরে। আমার চাকরীটা আর নেই। বড়বাবু তার ভাইয়ের চাকরী রাখতে পারেনি। এখন আমার হাতে অনেক সময়। দিন রাতের সব সময়টুকুই আমার। কোন কাজ নেই। অন্নচিন্তা নেই। এখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। কিন্তু পারি না। আমি কিছুই পারি না। পেরেছিলাম, খবর পেয়ে বাণী ছুটে এলে, তার মুখের সামনে ঘরের দরোজাটা স্বশব্দে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

আমি বুঝতে পারি আমার জন্যে বাড়ির সকলে খুবই চিন্তিতঃ। অবশ্য আমার মায়ের কথা স্বতন্ত্র। মাকে আমি কোনদিনই বুঝতে পারি না! এখন দেখি, মা আমার সামনে প্রায় আসেই না।

গত দেড় বছরে আমার শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে। মোটা নয়, দোহারা চেহারা ছিল আমার। রোগা হয়ে গেছি। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে কষ্ট হয়, মাথাটা জ্বালা করে। নিজের প্রতি বড় বিরক্তি জাগে।

আমি বাড়ি ফেরার পর ক'দিন ডাক্তার এসেছিল। আমাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। স্মৃতি এবং শ্রুতি ঠিকই আছে। কষ্ট শুধু শরীরটায়। ওষুধ খাচ্ছি সে জন্য।

একটা চিন্তাই আমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে। আমার দোষ কী? কেন আমাকে ধরা হয়েছিল?

রাজনীতি?

না, রাজনীতি আমি কখনো করিনি। কারণ, ওই জিনিসটা আমার মাথায় ঢোকেনি। কলেজে সুযোগ এসেছিল, দূরে থেকেছি। অবশ্য বাণী আমাকে বার বার নিষেধ করেছে।

আমি ছিলাম নীরব দর্শক। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছি। কিন্তু অন্যায় আমার বুকে আগুন জেলে দিয়েছে। আমি পথ খুঁজেছি, সত্য-সুন্দরের।

গায়ত্রী প্রসন্ন। আমার মাষ্টার মশাই। আমাদের পুরানো পাড়ার বাড়ির নীচের তলার বাসিন্দা। একলা থাকতেন। কাজ করতেন বউ বাজারের চশমার দোকানে। সকালে রাত্রে পড়াতেন আমাদের। প্রত্যক্ষ রাজনীতি কখনো করতে দেখিনি তাঁকে। কিন্তু রাজনীতির বইপত্র পড়তেন তিনি। সমস্ত পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস ছিল তাঁর সংগ্রহশালায়। পড়ে শোনাতেন, বোঝাতেন। পরে পরিচয় পেয়েছিলাম, ইংরেজের জেলখানায় জেলখাটা একজন স্বদেশী ডাকাত তিনি!

দাদারা বড় হতে চাকরী-বাকরী করার পর আমরা নতুন পাড়ায় এসেছি। যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। আমিই শুধু মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর কাছে। গল্প করে আসতাম। ফিরে এসে শুনলাম মাস ছয়েক আগে তিনি মারা গেছেন!

আমার এখন বড় বেশি করে মনে পড়ে তাঁকে। আজ ক'দিনই বার বার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে এই জন্যে, আজকের আমার এই অবস্থায় একমাত্র তাঁর সামনে গিয়েই দাঁড়াতে পারতাম আমি। কথা বলতে পারতাম। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করতেন। আমার কথা শুনতেন; আমাকে বুঝতেন।

কিন্তু কেউ আজ আমাকে বুঝতে চায় না। সহজভাবে কেউ চায় না আমার দিকে। সকলেরই দৃষ্টিতে আজ দেখতে পাই, অনুকম্পা-করুণা, একটু ভয়ও যেন মিশে থাকে।

কারণ আমার নাকি মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। ডাক্তারের তাই মত। একলা বসে থাকলে আমি নিজের মনেই কথা বলি। আগে এ অভ্যাস ছিল না। রাত্রে ঘুমন্ত আমি কখনো কখনো চিৎকার করে উঠি।

অনেকের ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। অবাক হই। বুঝতে পারি না কারণ। কি ঘটলো? কেন আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল আমার আপনজনেরা।

বুঝতে পারি না—আমি কিছুই বুঝতে পারি না। বিরক্ত হই, রাগ হয় আমার। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। নিজেকে সংযত করে নিই অনেক কষ্টে। সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলে আমি ভাবতে বসি। রাতের আকাশ দেখি। রাস্তার ল্যাম্প পোষ্টের আলো। মনে পড়ে না কোন কথাই। স্বপ্ন দেখেছিলাম কি? জানি না। আগে কখনো স্বপ্ন দেখলে মনে থাকতো। এখন সব সময় দুঃস্বপ্ন আমাকে ঘিরে। দেড় বছরের নরক জীবনটা আমার মন প্রাণ, সমস্ত সত্তায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সকলে যা ভাবে তা আমি নই। আমার চিন্তা শক্তি অটুট। শুধু মাঝে মাঝে জ্বালা ধরে মনে।

অথচ সেইসব দিন গুলোতে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল। রাজনীতির চরম প্রকাশ। আমি তখন ধীর, স্থির, শান্ত সংযত। আমি তখন ছাত্র। কিন্তু বুকের গভীরে আমার আগ্নেয়গিরির উত্তাপ। আমি পথ খুঁজছি। কোন নতুন পথ!

এই সময় একটা সমীক্ষা আমার চোখে পড়েছিল। সমীক্ষাটা ছিল শুধু মাত্র বৃহত্তর কলকাতার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজের শৃঙ্খলা-হীনতার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ।

সমীক্ষায় লেখা হয়েছিল, সংক্রামক রোগ স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে আপন অভিযান চালায় নিত্য নিয়মিত। শারীরিক এই সংক্রমণের হাত এড়াবার জন্যে আছে নির্দিষ্ট ছাড়পত্রের খবরদারী—কিন্তু মানসিক চিন্তা-ধারার সংক্রমণ এড়াবার জন্যে নেই তেমন কোন খবরদারীর হুঁশিয়ারী। তাই ছাত্র-বিক্ষোভ আর বিশৃঙ্খলতা আজ আর কোন বিশেষ

একটি স্থান, রাষ্ট্র বা দেশের মধ্যেই সীমায়িত নয়—যারা বিশ্ব জুড়ে এ ব্যাধি তার সংক্রমণ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিহত গতিতে। তবে একথাও ঠিকই যে, স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে এ সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ারও রূপভেদ ঘটছে, ঘটছে আর ঘটবেও।

অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মতই, সমস্যা জর্জরিত, ব্যাধি পীড়িত ভারতবর্ষের ও অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তথা ব্যাধি ছাত্র সমাজের এই শৃঙ্খলাহীনতা ও বিক্ষোভ। এ ব্যাধির মূলের সন্ধানে বিভিন্ন সমীক্ষা চলেছে—চলছে।

নয়া দিল্লীস্থ জাতীয় শিক্ষা ও শিক্ষণ পরিষদের (**National Council of Educational Research and Training**) অর্থানুকুল্যে কলকাতার গবেষণা সংস্থা—**Council of Social and Psychological Research** এই রকম একটি সমীক্ষার কাজ সুরু করেছিলেন ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল।

কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে। ছাত্র দরদী মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শিক্ষক সম্মেলনে যোগ দিলেন। যে কর্মসূচী হাতে নেওয়া হল তাতে রইল :

(১) প্রতিটি বিদ্যালয়ের সমীক্ষার আওতাভুক্ত ছাত্রদের 'সুশৃঙ্খল (**disciplined**)' ও 'বিশৃঙ্খল (**in disciplined**)' এই দুটি চূড়ান্ত গোষ্ঠীতে ভাগ করে প্রতিটি গোষ্ঠীতে প্রতি শ্রেণীর তিনজন করে ছাত্রকে চিহ্নিত করা,

(২) পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে (ক) মানসিক শক্তি পরিমাপক অভীক্ষা (**aptitude tests**) ও (খ) ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা (**Personality tests**) এ দু'ভাগে ভাগ করে দুটি কিস্তিতে প্রয়োগ করার পরিকল্পনা।

কিন্তু পাওয়া গেল না সাড়া। ১৬০টি বিদ্যালয়ের কাছে দরবার করে মাত্র ৩২টি বিদ্যালয়ের ২৮৫০ জন ছাত্রের ওপর বাস্তবিকপক্ষে সমীক্ষাটি চালান সম্ভব হল, তাও মাত্র অর্ধাংশটুকু।

'বিশৃঙ্খল' কথাটির মোটামুটি বাস্তব সম্মত যে কার্যকর সংজ্ঞাটি নির্দেশিত হল তা হচ্ছে, সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত ও গৃহীত রীতি-নীতি ও আচরণ-বিধির বিচ্যুতিরই অপর নাম বিশৃঙ্খলতা।

গৃহগত ও সামাজিক পরিবেশের তথ্যপূর্ণ এই তত্ত্বের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, বৃহত পরিবার ও পারিবারিক আয়তন, আর্থিক অস্বচ্ছল্য,

মৃত্যুজনিত কারণেই হোক, কিংবা কর্মসূত্রেই হোক মায়ের সান্নিধ্য সুখের অপ্রাপ্রণীয়তা, বাবা মায়ের শিক্ষাগত উৎকর্ষের বিভিন্নতা ইত্যাদি……

যেমন :—

পরিবারের আয়তন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা :	সুশৃঙ্খল :—	বিশৃঙ্খল :—
৫ কিংবা তার কম—	২৯·৬০%	২৫·৬০%
৯—১১ —	২২·২০%	২১·০০%
১৫—তার বেশি—	—	৮·০০%
বাবা মা জীবিত বা মৃত :—		
উভয়েই জীবিত—	৫৫·৫০%	৮৪·০০%
কেবল মাত্র বাবা জীবিত—	১৮·৫০%	—
কেবল মাত্র মা জীবিত—	১৮·৫০%	১২·০০%
উভয়েই মৃত—	৭·৪০%	৪·০০%
পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা :—		
একজন—	৩৮·৫০%	৬৬·৬০%
দুজন—	২৩·১০%	১৮·৫০%
চারজন—	১৫·৪০%	৭·৪০%
পাচ কিংবা তার বেশি—	৩·৭৫%	৭·৪০%
পারিবারিক আয় :—		
৩০০ টাকার নিচে—	৩৮·৫০%	৩৩·৩৬%
৫০০ টাকা পর্যন্ত—	২৬·৯৫%	২৯·১৯%
৭০০ টাকা পর্যন্ত—	১৯·২৫%	২৫·২০%
৯০০ টাকা পর্যন্ত -	৭·৬৫%	৮·৩৪%
৯০০ টাকার বেশি -	৭·৬৫%	৪·১৭%
ভাইবোনের সংখ্যা : -		
একমাত্র সন্তান —	৭·৩০%	১৬·৬৮%
১—৩ জন—	৩৩·৩০%	৩৩·৩৬%
৪—৬ জন -	৪৪·৪০%	১৬·৮৬%
৭—৯ জন -	৭·৪০%	১৬·৮৬%
১০ ও তার বেশি—	৭·৪০%	১৬·৮৬%

বাবা মায়ের শিক্ষাগত উৎকর্ষতা :—

	বাবা	মা	বাবা	মা
প্রবেশিকা পরীক্ষার নিচে—	১৬·৬৮%	৬৬·৭২%	২৩·৮০%	৬০·৯০%
প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ—	২৫·০২%	৮·৩৪%	১৪·২৮%	৮·৭০%
স্নাতক—	২৯·১৯%	১২·৫১%	২৮·৫৬%	৮·৩৫%
স্নাতকোত্তর—	১৬·৬৮%	৪·১৭%	১৯·০৮%	৮·৭০%

অভীক্ষা	সুশৃঙ্খল (১০২)	বিশৃঙ্খল (৮৬)
বুদ্ধি পরিমাপক/ব্যক্তিত্ব পরিমাপক—	৯৭·৩৫%	৯০·৯০%
নিষ্ক্রিয়তা—	৭·৭৩%	৭·৮৮%
নতি স্বীকার—	৪·৪৩%	৪·৩৮%
মানসিক ভারসাম্যের অভাব	৬·৩১%	৬·৯৫%
স্বয়ম্ভরতা—	৭·৮৪%	৬·৬৮%
আত্মনিয়ন্ত্রণ—	৬·১২%	৫·৫৬%

অভীক্ষা	সুশৃঙ্খল (১০২)	বিশৃঙ্খল (৮৬)
নীতিবোধের অসম্মাননা—	৩·৪৫%	৪·৪২%
নিরাপত্তা বোধের অভাব—	৪·১০%	৫·৩৪%
কর্তৃত্ববোধ—	৫·২৬%	৫·৩৩%

ব্যক্তিত্ব পরিমাপক একাত্মবোধ :—

বাবার সহিত—	১৫·২০%	২৮·০৪%
মায়ের সহিত—	৬২·৩৯%	৪৮·৭৮%
ভাইবোনের সহিত –	০·৭০%	১১·৬২%
অন্যান্য আত্মীয়দের সহিত –	৪·২৭%	১·২১%
বন্ধুদের সহিত—	২·১৩%	২·০৩%
শিক্ষকদের সহিত—	১১·৭০%	১২·৬০%

ছাত্র সমাজের বিশেষ কতকগুলি সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন তালিকার উত্তর পত্র বিশ্লেষণ প্রাপ্ত তথ্য :—

	সুশৃঙ্খল (৮৪)	বিশৃঙ্খল (৭৫)
শিক্ষা ব্যবস্থা :—		
মতৈক্য—	১০·৮৯	১২·৫২
মতানৈক্য –	১০·৯৬	১১·৩৫

গৃহ-পরিবেশ :—		
মতৈক্য—	১৫·০০	১৫·৮৮
মতানৈক্য —	১৩·৬৬	১৪·৫৬
রাজনীতি : -		
মতৈক্য—	৪·২২	৪·২৬
মতানৈক্য—	৬·৬৩	৬ ৬৫
নীতিবোধ :—		
মতৈক্য -	.৯·৩৭	৯·৮০
মতানৈক্য -	৫·২৪	৪·২৬
সরকারী নীতি :—		
মতৈক্য —	৪·৫৬	৬·০৫
মতানৈক্য —	৮·৫২	৮·০০
বিদ্যার্থী সমস্যা সূচী :—	সুশৃঙ্খল (৮৬)	বিশৃঙ্খল (৮২)
স্বাস্থ্য —	৬·৫৯	৫·৭৩
সামাজিক পরিবেশ—	৭·১০	৬·৮৫
মনোসামাজিক সম্পর্ক -	৬·৮১	৬·৬৬
গৃহ ও পরিবার -	৫·৯	৬·৭৬
ব্যক্তিগত সম্পর্ক --	৭·৮৪	৬·৭৮

আমার বুকের আগুনের সন্ধানই দিয়েছিল সেই সমীক্ষা। বৃহৎ পরিবেশে আর্থিক অস্বাচ্ছল্যো, পিতার সদাজাগ্রত সতর্ক কিন্তু সস্নেহ দৃষ্টির অভাবে মাতৃস্নেহ বুভুক্ষু কিশোর যখন বিপুলা এ পৃথিবীতে নিঃশব্দ একাকীত্বে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার ঘরে জীর্ণ হতে থাকে, শিক্ষাধারার ভ্রান্ত নির্বাচনে স্কুলের পরিবেশ যখন আরও অসহ, আরও নীরস হয়ে উঠতে থাকে, নিরাপত্তাবোধের অভাবে, ব্যর্থতায়, নীতিবোধের অবচেতনায় প্রাত্যহিক জীবন যখন টুঁটিটিপে ধরতে চায় তখনই সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃতও গৃহীত রীতি-নীতির ও আচরণ বিধির বিচ্যুতি ঘটিয়ে জন্ম নেয় বিশৃঙ্খল বিক্ষুব্ধ প্রাণ পুরুষ। উত্তেজনার আগুনে সে সর্বক্ষণ ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে আর মুহূর্তের উস্কানিতে সমগোত্রীয় সকলকে নিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ে চারিদিক কাঁপিয়ে।

এক সময় আমিও ফেটে পড়তে চেয়েছি। ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছি সেই উত্তাল সমুদ্রভঙ্গে। বাধা পেয়েছি। গায়ত্রী প্রসন্ন আমার হাত টেনে

ধরেছেন। সাবধান করেছেন। আমার চোখ খুলে দিতে চেয়েছেন তিনি।

বলেছেন, 'রুদ্র সাবধান, ভুল করিসনি।'

বলেছি, 'ভুল কোথায়?'

—'তোর নিজের মধ্যে।'

—'কে বললে?'

—'আমি বলছি। ছু দিন পরে তোরও মনে হবে।'

—'বাধা দিচ্ছেন?'

—'না।' মৃদু কণ্ঠে বলেছেন, 'আমি সাবধান করে দিচ্ছি শুধু।'

—'কেন?'

—'ওই আগুনে কেন ঝাঁপ দিবি? কোন আদর্শ বুকে নিয়ে?'

—'আদর্শ!'

—'নিশ্চয়ই।' কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে চাস সেটা আগে ঠিক কর। যদি ঠিক করতে পারিস, আমার সাবধান তখন কানে বাজবে না তোর, প্রশ্নও তুলবি না এখনকার মত। আর আগুনে পুড়ে যদি ছাই হয়ে যাস তখন, আমার এতটুকু দুঃখ হবে না তোর জন্যে। কিন্তু রুদ্র, আগে ঠিক কর লক্ষ্যটা। মিথ্যা ঝাঁপ দিলে শুধুমাত্র দগ্ধ হবি। ঘাটা হয়তো ভাল হবে একদিন জ্বালা থেকে যাবে চিরদিনের মত।'

গায়ত্রী প্রসন্ন বলতেন, 'দুশো বছর বৃটিশ বণিকরা সমস্ত দেশটাকে শোষণ করেছে যে প্রশাসনিক যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর সেই যন্ত্রের কিন্তু এতটুকু পরিবর্তন হল না। অথচ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বলেছিলেন—"**If a system is wrong and injures us, it has to be changed. It makes little diffenence who runs it, and even good People are helpless in bad system, with the best will in the world you cannot convert stores and earth into good food, however much you cook them.**" স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্পষ্ট শোষণ ভিত্তিক প্রশাসন যন্ত্র যে বিধি নিয়মে চলত তাতেই শুধুমাত্র স্বদেশী ষ্ট্যাম্প দিয়ে সারা দেশে চালু করল। ফলে শাসন ব্যবস্থা মুখ্যত যে বিরাট

পদস্থ কর্মচারী বাহিনীর ওপর ন্যস্ত ছিল তারাই হল প্রসাশন যন্ত্রের বিধাতা। বহু গালভরা কথার ফুলঝুরি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র থেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি শুধু মাত্র প্রতিশ্রুতিই থেকে গেল। কাজ নয় শুধু কথা। কিন্তু কথায় তো পেট ভরে না। পেট ভরল না সাধারণ মানুষের। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, গরীব আরো গরীব হল—ধনী আরো ধনী। হয়েছে—হচ্ছে—হবে।

প্রতিবাদ করতাম আমি। বলতাম, 'যাতে তা না হয়, সেই জন্যেই তো আন্দোলন। শাসকশ্রেণীর অন্যায় অবিচার, শোষণ বন্ধ করার জন্যে।'

—'বন্ধ হবে কি ?'

—'কেন হবে না, নিশ্চই হবে।' ভারতবর্ষের লক্ষ কোটি গণ-চেতনা-সম্পন্ন মানুষের আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।'

আমার কথা শুনে অবাক। এক অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন গায়ত্রী প্রসন্ন।

জিজ্ঞাসা করতাম, 'কি দেখেছেন ?'

—'তোকে।'

মনে মনে রাগ হ'ত আমার। বলতাম, 'দেখেননি নাকি কোন দিন ?'

মুচকি হাসতেন তিনি। বলতেন, 'বাঁধা গত যখন আওড়াচ্ছিস তখন তোকে দেখতে হবে বৈকি ?'

আমি গুম হয়ে চুপ করে থাকতাম।

তিনি সহজ কণ্ঠে বলতেন, 'রাগ করিসনি রুদ্র। জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি বলছি। ভুল হয়তো আমার হতে পারে। কিন্তু ভুল বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। একজন বিখ্যাত বিদেশী নাট্যকার কি বলছেন জানিস।

One man has two eyes,
The Party has a thousand eyes,
The Party overlooks seven states,
One man sees one city,
One man has his hour
But the Party has many hours,
One man can die
But the Party cannot be killed,

For it is the avant-garde of the masses
And leads their fight.

'মানুষ নয় রুদ্র—দল। দলবাজি চলছে আজ। মানুষ নয়, দলের স্বার্থটাই বড়। যেমন করেই হোক দলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেই জন্যে দিন দিন বাড়ছে মিথ্যাচার। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। দল-উপদল। নেতা সাজার প্রতিযোগীতা। সাধারণ মানুষ, নিরন্নের দল বাঁচতে চায়, আলো খোঁজে, ছিঁড়তে চায় বন্ধনের শেকল। পার্টির দাদারা তাদের কাছে টানে, প্রলোভন দেখায়, নিজেরা পিছন থেকে এগিয়ে দেয় শাসকশ্রেণীর বুটের তলায়।'

কথাগুলো অস্বীকার করতে পারতাম না। চুপ করে থাকতাম।

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে মানুষের সমান অধীকার। ভারতবর্ষের সংবিধান সেই কথাই বলে। তাই শাসকশ্রেণীর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার নিশ্চই আছে মানুষের।

প্রতিবাদ করেছে মানুষ। বার-বার। আজও করে চলেছে। আর শাসকশ্রেণী প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পুলিশ দিয়ে লাঠি চালিয়েছে, কাঁদুনে গ্যাস ছুড়েছে, গুলি করে শেষ করে দিয়েছে অসংখ্য তাজা প্রাণ। স্বাধীন ভারতবর্ষে পুলিশের গুলীতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃটিশ শাসনের দু'শো বছরের পুলিশী অত্যাচারকে হার মানিয়েছে।

ইংরেজ শাসনকালে কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের ওপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৪৬ সালে (এই বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করে; তাছাড়া ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশে গণ অভ্যুত্থান সুরু হয়) বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ খাতে ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। স্বাধীন ভারতবর্ষে ১৯৭৩-৭৪ সালে ব্যয়ের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩১২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকায়

এবার কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯৫০-৫১ সালে এই খাতে ৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। তারপর থেকেই ব্যয় বৃদ্ধি সুরু। যেমন:

১৯৬৪-৬৫ সালে—২৫ কোটি টাকা।

১৯৬৮—৬৯ সালে—৭২ কোটি টাকা।

১৯৭৪-৭৫ (বাজেট বরাদ্দ)—১৬৯ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী

এখন বিভিন্ন রাজ্যে সমান্তরাল পুলিশ বাহিনী হিসাবে কাজ করছে)।

সি. আর. পি পোষার খরচ :

১৯৬০-৬১ সালে—১'৯৭ কোটি টাকা।

১৯৭৩-৭৪ সালে—৩৯'৪৪ কোটি টাকা।

বি. এস. এফ এর জন্যে ব্যয় :

১৯৬৮-৬৯ সালে—২৬'২৪ কোটি টাকা।

১৯৭৪-৭৫ সালে—৫৭'৪১ কোটি টাকা (আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে বি. এস. এফ গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু গণ আন্দোলন দমনই এখন এই বাহিনীর প্রধান কাজ। সি. আর. পি-র ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য)।

আর গুলি চালনার হিসাব :—

রাজ্যের নাম	কতবার সি. আর. পি ও বি. এস. এফ গুলি চালিয়েছে (১৯৭১-৭৪)	কতজন মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে (১৯৭১-৭৪)
অন্ধ্রপ্রদেশ—	২৬	২৬
আসাম—	২	১
গুজরাট	১৩	১
জম্মু ও কাশ্মীর—	৩	×
উত্তর প্রদেশ	১	×
মণিপুর—	১১	×
নাগাল্যাণ্ড	১০	×
কেরালা—	১	×
পশ্চিমবঙ্গ	১১৩	৫৩
বিহার	২১	২১
মোট—	২১৯	১০২*

বিহারে সি. আর. পি পোষার ব্যয়

ফেব্রুয়ারী—	(১৯৭৪)	৩৮, ২১৯ টাকা
মে—	(„)	১৮,৪৯,৩০৮ টাকা
আগষ্ট—	(„)	৩৩,৭০,০০০ টাকা
সেপ্টেম্বর—	(„)	৩৪,০৮,১০০ টাকা

নভেম্বর („) ৩৮,৫২,১০০ টাকা

সূত্র—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এই হিসাবে আহতদের সংখ্যা ধরা হল না)।

ডিসেম্বর (১।১২।৭৪-৭।১২।৭৪-৭ দিন) ৭,২৪,৭০০ টাকা

মোট—২,৩৮,০২,২৪৬ টাকা মাত্র।

২,৩৮,০২,২৪৬ টাকা কেন খরচ হয়েছে, না, শুধু মাত্র গণ আন্দোলন দমনের জন্য।

যথা আমি কোন আন্দোলন করিনি। কোন মিছিলের সঙ্গে পায়ে পায়ে হাটিনি পর্যন্ত। ভয়ে? না, ভয় নয়। আমার বিশ্বাসটাকে আমি ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম সুদিন আসবেই। নিশ্চয়ই মানুষের দুঃখ দারিদ্রের অবসান হবে। ন্যায় বিচার পাবে সকলেই।

কিন্তু আমি কি পেলাম? কি দেখলাম? কি শুনলাম সেখানে?

প্রথমে কালো গাড়িটায় চেপে থানায় গেলাম। আমার সঙ্গী ছিল আরো তিন চারজন। এক গাড়ির মধ্যেই আমার হাতের ঘড়ি ম্যানি ব্যাগ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সিগারেটের প্যাকেট সন্ধান করেছিল শান্তি রক্ষকের দল। না পেয়ে বিরক্ত হয়েছিল তারা।

রাত যখন প্রায় বারোটা আমি থানায় অফিস ঘরে স্যারের সামনে দাঁড়ালাম। স্যার আরক্ত নেত্রে আমার দিকে চাইলেন। আমাকে দেখলেন কবার। কম্বু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুয়োরের বাচ্চার নাম কি?'

সঙ্গের ইনেসপেক্টর আমার নামটা বললেন।

স্যার কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি কুঁকড়ে গেলেন। স্যার বললেন, 'কিরে শালা শুয়োরের বাচ্চা, হাবা নাকি তুই?'

বাজপড়া অবস্থাটা আমার অনেকটা কেটে গেছে তখন। বুঝতে পারছি পরিণতি। শুধু বুঝতে পারছিলাম না কেন আমাকে ধরে নিয়ে আসা হল! আমি চুপ করে রইলাম।

স্যার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমার গালে চড় মারলেন। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলাম নিজেকে। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। পাশ থেকে মৃদু কণ্ঠস্বর কানে এল, 'উত্তর দিন।'

আমি ইনেসপেক্টরের দিকে চাইলাম। তিনি চোখের ইসারা করলেন।

আমাকে মেরে স্যার বসে ঢুলছিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'নাম কি তোর।'

—'রুদ্র প্রসাদ চৌধুরী।'

—'বাঃ, এই তো।' তারিফ করলেন স্যার। 'কেন তোকে ধরা হয়েছে জানিস?'

'—না।' আমার স্পষ্ট উত্তর।

—'চমৎকার।' ফিক্ ফিক্ করে হাসলেন স্যার। নড়ে চড়ে আরাম করে বসলেন। বললেন, 'এখানে এসে সকলেই একই কথা বলে। এঁ্যা।' আবার হাসলেন স্যার। শিবনেত্রে আমাকে দেখলেন। 'বাঃ চেহারাটাতো বড় মিষ্টি। বিয়ে করেছিস?'

কি বলবো ঘৃণায় আমার সর্ব শরীর রি রি করছিল। চুপ করে রইলাম।

—'কিরে শালা পাঁঠা, চুপ করে রইলি কেন?'

ইচ্ছা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে অসভ্য বর্বরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। টুঁটিটা টিপে ধরি। ইনেসপেক্টর সাবধান করলেন আমায়। বললাম, 'বিয়ে করিনি।'

—'কেন?'

অপ্রকৃতস্থ লোকটার কথায় কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

পুলিশ অফিসার নামক লোকটা চিৎকার করে উঠলো হঠাৎই, 'শালা হারামীর বাচ্চা, শালা বিয়ে করনি কেন? নাড়ু গোপালের মত চেহারা নিয়ে ছুঁড়িদের সঙ্গে খুব ফুর্তি মারা হচ্ছে? এঁ্যা! শালা তোমাকে ধরার জন্যে আমি কম নাকাল হয়েছি। তুমি ভেবেছিলে কেউ তোমার টিকিটি ছুঁতে পারবে না, তাই না?'

কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারিনি! লোকটা বলছে কি? হতবুদ্ধি আমি, বলছিলাম, 'আপনি বোধহয় ভুল করছেন?'

'ভুল করছি?' সোজা হয়ে বসেছিল লোকটা। হঠাৎ হেসে উঠেছিল। হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'ও হো, তুমি বলছো তোমাকে ধরে ভুল করেছি আমি। কেন যাদু?'

মরিয়া হয়ে বলেছিলাম, 'আপনি কার কথা বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

—'বুঝতে পারছো না, বটে। কেন শুনি?'

—আমার মনে হচ্ছে আপনি অন্য কারো কথা বলছেন।' বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম আমি।

লোকটা একটু মিস্ হয়েছিল। বলেছিল, 'আমি তোমার কথাই বলছি। তোমার নাড়ি নক্ষত্র বলবো শুনবে?'

বলতে বলতে লোকটা আমার নিজের নাম, বাবার নাম, দাদাদের অফিস এমনকি বাণীর কথা পর্যন্ত বলেছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত একটা ভয়ে আমি শিউরে উঠেছিলাম। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে বলেছিলাম, 'কিন্তু আমাকে ধরা হল কেন?'

'তুই সমাজ বিরোধী।'

'সমাজ বিরোধী?'

শুধু তাই নয়, আরো অনেক চার্জ আছে তোর বিরুদ্ধে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন পাষাণে পরিণত হয়েছিলাম। আকাশ মাটি আলো অন্ধকার সবকিছু আমার চোখে একাকার হয়ে গিয়েছিল। চিন্তা শক্তি লুপ্ত হয়েছিল আমার।

সংবিত ফিরতে দেখেছিলাম থানা হাজতের লোহার দরজাটা বন্ধ হয়েছে আমার চোখের সামনে। আমার ছাব্বিশ বছরের জীবনের সমাপ্তী!

অথচ আমি, রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরী, যে আমার অনেক কিছুই করার কথা— আমি কিছুই করিনি। আমি সৎভাবে থেকেছি জীবনের ছাব্বিশ বছর— বাঁচতে চেয়েছি। স্বপ্ন দেখেছি। আমি হারিয়ে যেতে চাইনি।

গায়ত্রীপ্রসন্ন বলতেন, 'নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব বড় কম কথা নয়। উভয়পক্ষে দায়িত্ব হীনতার পরিচয় দিলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। আজ হয়েছেও আমাদের ঠিক তাই। রাষ্ট্র দায়িত্ব পালন করেনি। রাষ্ট্র নেতার দলও বহু ক্ষেত্রে ভুল পথ অনুসরণ করেছেন, বিভ্রান্ত করেছে মানুষকে। ঠকিয়েছে— ঠকাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি করেছি। কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছি আমরা। ভারতবর্ষে নয়, আমি পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি। প্রশাসন দুর্নীতি গ্রস্থ কাজের থেকে অকাজ বেশি। কিন্তু এইটুকু জায়গাটায় কতগুলো দল বলতো? ছত্রিশ দলের ছত্রিশটা বারোয়ারী পূজার আয়োজন এখানে। আমরা ছত্রিশ দলে ভাগ হয়ে আছি। অথচ আমাদের এবং দলগুলোর লক্ষ্যাণাদি একটাই।

তাহলে আমরা এক হতে পারছি না কেন, বাধাটা কোথায়? আমরা যদি এক হই তাহলে শাসকশ্রেণীর সাধ্য কি আমাদের দুর্বার গতিকে রুদ্ধ করে? পুলিশ—মিলেটারী? না, রুদ্ধ কোন কিছুর পক্ষেই দমিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, প্রকৃত গণ জাগরণকে। ভারতবর্ষের নিপীড়িত অত্যাচারীত মানুষ ঘুম ভেঙ্গে যেদিন প্রকৃত জেগে উঠতে পারবে সেদিনই হবে পরিবর্তনের সূচনা। কিন্তু ছত্রিশ দলের নেতারা যেমন চায় না তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাক, দলমত নির্বিশেষে মানুষ এক হোক—তেমনি শাসক দল সব সময় চায় হাজারটা মতের দল গজিয়ে উঠুক ছাপান্ন কোটি মানুষের জন্যে।'

গায়ত্রী ও প্রসন্নের কথাগুলো শুনেছি। চিন্তা করেছি। একি বলছেন তিনি!

আর আজ? আজ ভাবতে পারি না। সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। বার বার খেই হারিয়ে ফেলি। বুকের মধ্যে জ্বালা বাড়ে। দগ্ধ হই। দেড় বছরের জেলখানার নরক যন্ত্রণা আমাকে অস্থির করে তোলে। সত্য সত্যই কি আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে? আমি কি আজ আর সুস্থ নই?

সুস্থ কি ভারতবর্ষের কর্ণধারগণ? সন্দেহ হয়। কথায় আর কাজে এত ফারাক কেন? কেন বারবার নির্লজ্জ মিথ্যার বেসাতী? কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে?

মাত্র কয়েক বছর আগে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলা হয়েছিল, দেশে একটা সবুজ বিপ্লব ঘটে গেছে। আমরা খাদ্যে সয়ম্বর হয়ে গেছি। দেশের আর একজন মানুষও না খেয়ে থাকবে না।

তারপরই সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। জয় কংগ্রেসেরই। সরকার ঘোষণা করলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর পি. এল. ৪৮০-র খয়রাতি খাদ্য আমদানী হবে না, এবং ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী বিদেশ থেকে যাবতীয় খাদ্য সাহায্য নেওয়া বন্ধ করা হবে। কিন্তু…আবার সেই চুক্তি। আবার আমদানী। কারণ, আমদানী না করে উপায় কি? স্বাধীন ভারতবর্ষের কর্ণধারগণের দূরদর্শীতা যে সুদূর প্রসারী! বলাবাহুল্য, সর্ববিষয়ে!

যেমন,

* বেকারি বৃদ্ধি :—

(১) প্রতি বছর বেকারি বেড়েছে শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ

(২) বেকারি বৃদ্ধির পরিচয় :

প্রথম পরিকল্পনার ঠিক পূর্বে—৩৩ লক্ষ

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে—১ কোটি

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে (আনুমানিক) ২ কোটি ৮০ লক্ষ

১৯৮০ সাল নাগাদ (আশা করা যাচ্ছে) ৬ কোটি

বৈদেশিক ঋণের বোঝা :—

পরিকল্পনার যুগ সুরু হওয়ার আগে ১৯৪৮-৪৯ সালে ক্রেডিট ব্যালেন্স পাউণ্ডে ছিল ১৭ কোটি পাউণ্ড।

(১) মোট বকেয়া বৈদেশিক সরকারি ঋণ :

১৯৫০ এর শেষে মার্কিন ডলারের সমমূল্যে ৪০ কোটি (আনুমানিক)

১৯৬৬-র শেষে ৬৯০ কোটি (আনুমানিক)

১৯৭৪-এর শেষে—৬৮৮২ কোটি টাকা [১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের যে ষ্টারলিং ব্যালান্স ছিল, তার পরিমাণ ১৬৫০ কোটি টাকারও বেশি। পঞ্চাশের দশকে হরেক রকমের বিলাস দ্রব্য আমদানি করে আর নয়তো বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা বসিয়ে (যা শতকরা কুড়ি ভাগ লোকেরও কাজে লাগে না) বাবুরা দুদিনেই তা উড়িয়ে দেন]।

(২) ঋণ বাবদ সার্ভিসিং চার্জ :

	রপ্তানি থেকে আয়ে শতকরা হিসাবে	মোট পরিমাণ মার্কিন ডলারের সমমূল্যে
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে	৪ শতাংশ	২৫ কোটি
তৃতীয় পরিকল্পনা কালে	১৪ শতাংশ	১১৫ কোটি
১৯৬৪-৬৯	২৮ শতাংশ	১৮৯ কোটি ২০ লক্ষ
১৯৭০-৮০	(আনুমানিক-?)	২৭৪ কোটি ৪০ লক্ষ

* মুদ্রামূল্যের ডেপ্রিসিয়েশন (মুদ্রাস্ফীতি)

(১) সরকারী বিনিময় হার (প্রতি মার্কিন ডলারে ভারতীয় টাকা, প্রতিবছরের শেষে)

১৯৫৮—১৯৬৫	৪·৭৬
১৯৬৬-৬৭-৬৮	৭·৫০

(২) মার্কিন ব্যাঙ্ক নোটের অবাধ বা কালোবাজারের দর এবং/অথবা নিউ-ইয়র্কে আনলাইসেন্সড ট্রান্সফার (প্রতি বছরের শেষে জুন মাসে, প্রতি মার্কিন ডলারে ভারতীয় টাকা)।

১৯৫৮—	৫·১৯
১৯৫৯—	৫·৭৬
১৯৬০—	৭·০০
১৯৬১—	৭ ২২
১৯৬২—	৭·৪০
১৯৬৩—	৬·৬০
১৯৬৪—	৮·৫০
১৯৬৫—	৯·৫০
১৯৬৬—	১২·০০

(৩) দশ বছরের মুদ্রা সংক্রান্ত ইতিহাস : ১৯৫৭—৬৬

অর্থ প্রচার	ঊর্দ্ধাভিমুখী	৯৪ শতাংশ
আভ্যন্তরিণ ক্রয় ক্ষমতা	নিম্নাভিমুখী	৪৬ শতাংশ
অবাধ বাজার মূল্যের পরিবর্তন	"	৫৩ শতাংশ
অবমূল্যায়নের সংখ্যা	"	১ শতাংশ

* মাথা পিছু নীট জাতীয় উৎপন্নের সূচক সংখ্যা (ভিত্তিবর্ষ ১৯৪৮—৪৯)

১৯৪৮—৪৯	১০০
১৯৬৬—৬৭	১২০·৫ (১৯৪৮-৪৯ এর মূল্য মানে)

(অর্থাৎ বৃদ্ধিটা হল ২০ বছরে ঠিক এক পঞ্চমাংশ বা ২০ শতাংশ—আসল কাজের ভিত্তিতে মাথা পিছু নীট জাতীয় উৎপন্ন দ্বিগুণ করতে লাগবে একশো বছর !)

* খাদ্য আমদানী—১০ লক্ষ টনের হিসাবে

১৯৫৫—	০ ৬০
১৯৫৬—	১·৪০
১৯৫৭—	৩ ৬৩
১৯৫৮—	৩·২২
১৯৫৯—	৩·৬৮
১৯৬০—	৫·১৩
১৯৬১—	৩·৪০
১৯৬২—	৩·৬৪
১৯৬৩—	৪·৫৫

১৯৬৪ -	৬'২৬
১৯৬৫ —	৭'৪৫
১৯৬৬—	১০'৪০

[পি.এল. ৪৮০র ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য (বেশিটাই গম) এসেছে। এর দাম ৩২০০ কোটি টাকার ওপর! এর একটা অংশ (শতকরা প্রায় কুড়িভাগ) ভারত সরকারকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয় এবং আর এক অংশ (শতকরা প্রায় একষট্টি ভাগ) দেওয়া হয় ঋণ হিসাবে। তা বাদে শতকরা ছয় সাত ভাগ দিয়েছে বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানে, আর শতকরা প্রায় তের ভাগ ভারতে মার্কিন দূতাবাস তাদের নিজেদেরে কাজে লাগিয়েছে।

পি.এল. ৪৮০ এবং অন্যান্য সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষকে যে ঋণ দেয়, তার মধ্যে ওয়াশিংটন মোট ৭৫,৭৫২ কোটি টাকা মকুব করে দিয়েছে। ১৯৭৪ এর চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া যাবে তিন লক্ষ টন খাদ্য শস্য। কারণ, সংগ্রহনীতি ব্যর্থ।]

ভারতবর্ষের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ (ডিসেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত) ৬৯২৫ হাজার কোটি ৮০লাখ টাকা।

এর মধ্যে ৬৬০৭ কোটি ৬৮লক্ষ টাকা দিতে হবে বিদেশী মুদ্রায়। ৩১৬ কোটি৮১ লক্ষ টাকা শোধ হবে জিনিসপত্র রফতানি করে। আর বাকিটা টাকায় শোধ করা চলবে। এবং ১৯৭৫-এ শোধ করতে হবে ২৬২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতের ঋণের পরিমাণ ২৪১১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কাছে ১৪৫১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। পশ্চিম জারমানির কাছে ৫৫৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। আর ব্রিটেনের কাছে ৯০৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা।

আমরা (ভারতবর্ষের কর্ণধারগণ) ঢাকঢোল বাজাতে ওস্তাদ (প্রমাণ—নির্বাচন, সভাসমিতি, শিলান্যাস অনুষ্ঠান, তথ্যচিত্র ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি)। আমাদের পরিকল্পনাগুলির এমনই মহিমা যে, ১৯৬১ সাল থেকে যতই জোর কদমে ছুটিনা কেন, ক্রমেই পিছিয়ে পড়েছি (এখনতো কার্যত পরিকল্পনার বাতি বুত গিয়া!)। সরকার বলেছিলেন, উৎপাদন বাড়লেই দাম কমবে। কিন্তু কি দেখলাম আমরা? উৎপাদন অনেক বাড়া সত্ত্বেও দামতো কমলই না, বরং

দেখতে দেখতে আকাশ ছুঁলো। ১৯৫১ সালে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়েছিল পাঁচ কোটি দশ লক্ষ টন, এখন এসে দাঁড়িয়েছে দশ কোটি টনে। অর্থাৎ খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ।

১৯৫১ সালের তুলনায় লোক সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ছাপান্ন ভাগ (যদিও জন্ম নিয়ন্ত্রণের ঢাক্কা নিনাদে আকাস বাতাস মুখরিত! ইদানীং অবশ্য কিছুটা স্তিমিত)। তবুও বলতে হয় এই হিসাবে মাথা পিছু খাদ্যের পরিমাণ বাড়া উচিত। ১৯৫১ সালে যেক্ষেত্রে মাথা পিছু খাদ্য ছিল দৈনিক ৩৯৫ গ্রাম, ১৯৭২ সালে সেক্ষেত্রে হওয়া, উচিৎ ছিল ৪৬৭ গ্রাম। অথচ হয়নি। কারণ……

* মাথাপিছু জাতীয় আয়—উন্নত জাতি গুলির তুলনায় বৃদ্ধি।

(১) ভারতে বর্তমান মান হল প্রতিমাসে ৪০ টাকা (১৯৬৫ খ্রিঃ)

(২) ১৯৫০ এ পাঁচটি উন্নততম জাতিকে ধরে তাদের মাথাপিছু গড় আয় হল ভারতবর্ষের তুলনায় ১৩ গুণ বেশি।

(৩) ১৯৬৫ তে সেই পাঁচটি জাতিকে ধরেই, তাদের মাথাপিছু গড় আয় হল ভারতবর্ষের তুলনায় ২২ গুণ বেশি।

(৪) ব্যবধানটা আরো বেড়েছে এবং বাড়ছে (১৯৭৪ সালে বিদায়ী-মার্কিন রাষ্ট্রদূত ময়নিহান বলেন, ভারতের অর্থনীতি একটা বদ্ধজলার দশাপ্রাপ্ত হয়েছে।…ভারতের নেতারা—কথাটা তাঁরা স্বীকার করুন আর নাই করুন—এই রকমের একটা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দেশের মঙ্গল ও তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের তুলনায় আভ্যন্তর সুস্থিতির গুরুত্বই বেশি।

অন্যদিকে শ্রী ব্রেজনেভ বলেছেন, (সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির তিনি জেনারেল সেক্রেটারী এবং এ দেশের সি. পি. আই সহ হরেক দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির চিন্তাধারা তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন) ভারতবর্ষ বেশ সফল ভাবেই তার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করে যাচ্ছে।

ময়নিহানের বক্তব্য—ভারতবর্ষের শাসকবর্গ কায়েমী স্বার্থের পরিপোষণ করে যাচ্ছেন।

ব্রেজনেভের বক্তব্য—ভারতীয় জন সাধারণের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে এবং ধনী দরিদ্রের ফারাক এ-দেশে ক্রমেই কমে আসছে।

* অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমাজ বিরোধী প্রবণতা দূর করার অনিচ্ছা ও অক্ষমতা একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ১৯৬৫র হিসাব।

(১) ৭৫টি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সমস্ত বে-সরকারী ও নন ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির সম্পত্তির (৫৫৫২·১৪ কোটি টাকা) ৪৬·৯ শতাংশের (২৬০৫·৯৫ কোটি টাকা) মালিক।

(২) সেই ৭৫টি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সমস্ত বে-সরকারি ও নন ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির মোট আদায়ীকৃত মূলধনের (১৪৬৫·৪৬ কোটি টাকা) ৪৪·১ শতাংশ (৬৪৬·৩২ কোটি টাকা) নিয়ন্ত্রণ করে।

* অসংগৃহীত আয়কর

অক্টোবর, ১৯৬৮-তে পার্লামেন্টে বিবৃত অঙ্ক অনুযায়ী—

(১) মোট ৬২০·১০ কোটি টাকা।

(২) ১৫টি ফার্ম ও ব্যক্তির কাছে এক কোটি টাকা করে পাওনা!

(সরকারের হাতে আইনের অস্ত্রের অভাব নেই। ইচ্ছা করলেই প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে হয়না। কারণ, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি…)

আর পশ্চিমবঙ্গে ?

বর্তমান নব কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার দাবী, যুক্তফ্রন্টের আমলের দুঃস্বপ্নের রাত্রি কেটে গিয়ে নব অরুণের রক্তচ্ছটায় পশ্চিমবঙ্গ উদ্ভাসিত। ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করছে। এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। গতি তার দুর্বার। উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? কতটা এগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ?

এক সময় পশ্চিমবঙ্গের মাথা পিছু গড় আয় ছিল সারা ভারতবর্ষের সব রাজ্যের থেকে বেশি। অবশ্য আজ আর সেই দিন নেই। দেশ বিভাগের ধাক্কা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্ব বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র (কংগ্রেসী রাজত্বে), আর যুক্তফ্রন্টের তুঘলক শাহী শাসন কাল (যদিও জাতীয় আয় এক সময় কিছু বেড়েছিল), এবং নানান কারণে এরাজ্য এখন মাথাপিছু আয়ের ব্যাপারে অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে।

নেতারা ৭২ সালে শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে বলেছিলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের এই পিছিয়ে যাওয়াটা আটকাবই—আমরা এ রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবই। পশ্চিমবঙ্গে গড় মাথা পিছু আয় বাড়বেই।

কিন্তু নেতারা শত শত কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গে মাথা পিছু আয় কতটা বাড়িয়েছেন ?

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় প্রকাশিত হিসাব মত ১৯৭১-৭২সালে অর্থাৎ যখন নতুন সরকার ক্ষমতা নিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু আয় ছিল (১৯৬০-৬১ সালের টাকার দামের হিসাবে) ৩৫০ টাকা। এবং বন্যার মত উন্নয়নমূলক কাজের পর ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্যের বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় (৬০-৬১ সালের মুদ্রা মূল্যে) দাঁড়িয়েছে ৩৫১ টাকা ৪০ পয়সা মাত্র।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স বলেছেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় একটুও বাড়েনি, বরং কমে গেছে। এবং নতুন সরকার ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর দুবছরে আয় বাড়িয়েছেন ১.৪০ পয়সা, কিন্তু এই সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক খাতে সরকার মাথাপিছু খরচা করেছেন ২০ টাকা। অর্থাৎ ২০টাকার বিনিময়ে ১.৪০ পয়সা আয় বাড়িয়েছেন।

অবশ্য এর আগের কোন সরকারের আমলে (এমনকি ছত্রিশ দলের যুক্তফ্রণ্টেরও) পশ্চিমবঙ্গে এমন হাল হয়নি। ১৯৬০-৬১ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৩২০ টাকা ৭০ পয়সা। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৩৬ টাকা ৯০ পয়সা (১৯৬০-৬১ সালের মুদ্রামূল্যে)। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এই সময় প্রতি বছর মাথাপিছু বার্ষিক আয় বেড়েছিল ৩টাকা ২৪ পয়সা। ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৭১-৭২ পর্যন্ত বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি ২টাকা ২০ পয়সার মত। আর কর্মযোগী মন্ত্রী সভার দু বছরে মাথা পিছু গড় আয় বৃদ্ধি বছরে ৭০টি পয়সা।

এবার শিল্প। এ রাজ্যের শিল্প কিভাবে এগিয়ে চলেছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসাব মত পশ্চিম বঙ্গের ১৯৬৩ সালের মোট শিল্পোৎপাদনকে ১০০ ধরলে ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট দাঁড়িয়েছিল ১১২.৮, ১৯৬৭ সালে ১০৩.১, ১৯৭১ সালে ৯৫.৬, ১৯৭২ সালে ৯৭.৯ এবং ১৯৭৩ সালে ৯৬.৯। বেঙ্গল চেম্বার বলেছে, ১৯৭৪ সালে রাজ্যের শিল্পোৎপাদন মোটেই বাড়েনি বরং কমেছে।

এবং এই কম হওয়ার পেছনে যুক্তি আছে—বিদ্যুৎ সঙ্কট। কিন্তু বিদ্যুৎ সঙ্কট তো শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়—বিদ্যুৎ সঙ্কট আজ সারা ভারতবর্ষেই (মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সঙ্কট অনেক কম), তাহলে এই বিদ্যুৎ সঙ্কটের আমলেই ১৯৭১ সালের ১৪৩.৬ এর চেয়ে ১৯৭৩ সালে সর্বভারতীয় শিল্পোৎপাদন ৯ পয়েণ্ট বাড়ল কেমন করে?

মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যের অবস্থা এখন এত ভাল যে শত শত শিল্পপতি এখানে কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও

দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে রেজিষ্টারড কারখানার সংখ্যা খুব কমই বেড়েছে। ১৯৭০ সালের সংখ্যা ছিল ৫৬১২টি। ১৯৭২ সালে ৫৬১১টি। ১৯৭৩ সালে বেড়ে হয়েছে ৫৬২৯টি।

অবশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়:

একবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প কাঠামো উন্নয়ন করপোরেশনের মুখ্য হিসাবে কাজ করার পর আমার সুচিন্তিত অভিমত: রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থা ও অর্থনৈতিক দৈন্যের কথা চিন্তা করে সরকারী উদ্যোগে ও টাকায় নিত্য নতুন করপোরেশন গঠনের ঝোঁক এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। —পশ্চিমবঙ্গ ইনডাসট্রিয়াল ইনফ্রা-ষ্ট্রাকচার (শিল্প কাঠামো) উন্নয়ন করপোরেশন ও শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন সংস্থাদুটির চেয়ারম্যানকে সম্প্রতি চিঠি লিখেছেন প্রথমোক্ত সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেকটর।

১৯৭২ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মরাখাতে জোয়ার বইয়ে দেওয়ার নাম করে শিল্প-বানিজ্য দফতর গত তিন বছরে একের পর এক করপোরেশন গঠন করেছেন। কোনটির ওপর ভার দেওয়া হয়েছে শিল্পপতিদের বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার জন্য অনুন্নত এলাকায় শিল্প কাঠামোর ভিত গড়ে তোলার (আই আই ডি সি) কোনটির দায়িত্ব নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের (আই ডি সি)। কোনটির কাজ হল ইলেট্রকনিক শিল্পকে চাঙা করে তোলা (ইলেকট্রনিক শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন, ই আই ডি সি)। খনি সমূহের উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছে খনিজ উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক করপোরেশন (এম ডি টি সি। চিনি শিল্পের প্রসারের জন্য বসানো হয়েছে চিনি শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন (এস আই ডি সি)। ওষুধ শিল্পের জন্য রয়েছে ফার-মাকিউটিক্যাল ও ফাইটো কেমিক্যাল উন্নয়ন করপোরেশন (পি পি ডি সি)। শিল্পমন্ত্রীর শিল্পবাণিজ্য দফতর গত তিন বছরে দুটি নতুন কারখানা খুলতে পারেননি, বসিয়েছেন দুটি করপোরেশন। এবং এই দুটি সাদা হাতি পোষার জন্যে প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে কম করেও চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র। রাজ্যের চল্লিশ লক্ষ বেকার যুবকের মধ্যে চল্লিশ জনও চাকরি পাননি!

শিল্প কাঠামো উন্নয়ন করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেকটর তাঁর ওই চিঠিতে খোলাখুলি ভাবে বলেছেন, মিথ্যে সরকারী টাকা ব্যয় করে উন্নয়নের নামে করপোরেশন খোলা হয়েছে। করপোরেশনের নিজস্ব ব্যয় মিটিয়ে হাতে এমন টাকা নেই যে, অনুন্নত এলাকায় রাস্তা বানিয়ে, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ

জুগিয়ে শিল্পপতিদের বিনিয়োগে উৎসাহী করে তোলা সম্ভব। তাঁর প্রস্তাব, অবিলম্বে এই সংস্থাটিকে তুলে দিয়ে শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক। তাহলে অন্ততঃ আর কিছু না হেকে বছরে রাহা খরচ বাবদ যে তিন লাখ টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা বাঁচবে।

অবশ্য শিল্প মন্ত্রীর দফতর থেকে সম্প্রতি 'পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের পর্যালোচনা' নামে যে পুস্তিকাটি প্রকশিত হয়েছে তাতে এই সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে: ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি বর্তমানে হলদিয়া, খড়গপুর ও কল্যাণীতে শিল্প কাঠামোর নয়া ভিত রচনায় ব্যস্ত। ওই পুস্তিকায় বলা হয়েছে, উত্তরবঙ্গ, শিলিগুড়ি, পুরুলিয়া, সাঁওতালডি, রামকানালি ও মুরশিদাবাদে ফারাক্কার উন্নয়নের কর্মসূচীও নাকি ওই সংস্থা তৈরি করে ফেলেছেন। শেষ পর্যায়ে বর্দ্ধমানে, আসানসোল ও দুর্গাপুরের উন্নয়নে হাত দেবেন সংস্থাটি। হলদিয়ায় দৈনিক চার কোটি গ্যালন পানীয় জল সরবরাহের একটি প্রকল্প নাকি ওই সংস্থা বর্তমানে কার্যকর করেছেন। এছাড়া ওই আটটি হবু শিল্পকেন্দ্রের রাস্তা ঘাট তৈরির কাজ, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ সংস্থাটি হাতে নিয়েছেন। ফলে শিল্পপতিদেরে মধ্যে নাকি হুটোপটি পড়ে গিয়েছে কে আগে ওই সব কেন্দ্রে কারখানা খুলবেন তার জন্যে জমি সংগ্রহে।

সংবাদপত্রের খবর:

আটটির মধ্যে পাঁচটি কেন্দ্রের কোন কাজ ওই সংস্থা হাতে নেননি। এমন কি কোন জমিতে উন্নয়নের কাজ শুরু হবে তা পর্যন্ত স্থির হয়নি। এ পর্যন্ত (২.৪.৭৫) করপোরেশন তিনটি কেন্দ্রে কিছুটা জমি সংগ্রহ করেছেন—কল্যাণীতে—২৪০ একর, খড়গপুরে—২৫০ একর, হলদিয়া—১০০ একর।

একশ একর জায়গায় পানীয় জল প্রকল্প ঠিকমত কার্যকর করতে হলে করপোরেশনের মতে দরকার কম করেও এক কোটি টাকা। ওই জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের আনুমানিক ব্যয় আরো এক কোটি টাকা (কারণ আর্থিক দুরবস্থার জন্ত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আজকাল কোথাও আর নিজব্যয়ে সাবষ্টেশন ও ট্রান্সমিশন লাইন বসান না)। একটি সিঙ্গল লাইন রেলওয়ে সাইডিং-এর ব্যয় পড়বে আনুমানিক পঞ্চাশ লাখ টাকা। রাস্তা ঘাটের জন্যে আরো পঞ্চাশ লাখ। মোট তিন কোটি টাকা।

ওই হিসাবে কল্যাণী, হলদিয়া ও খড়গপুরের জন্ত বর্তমান মূল্যমানে

আনুমানিক ব্যয় হবে কম করেও নয় কোটি টাকা। কিন্তু করপোরেশন প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে গত দুবছরে রাজ্য শিল্প বাণিজ্য দফতরের কাছ থেকে পেয়েছেন সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছে অফিস চালাতে।

হলদিয়ায় চারকোটি গ্যালন জলের প্রকল্পটি জন-স্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং দফতর তৈরী করেন ১৯৭১ সালে। তখনই এর ব্যয় ধরা হয়েছিল ছয় কোটি টাকা। বর্তমান মুল্যমানে দরকার নয় কোটি টাকা। টাকা নেই। অতএব শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে চার কোটির বদলে দৈনিক আশি লাখ গ্যালন জলের একটি প্রকল্প কার্য্যকর করা হবে। এবং তার জন্যেও দরকার দু' কোটি বাইশ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পঞ্চম যোজনায় এই প্রকল্প শেষ করতে হলে প্রতি বছর কম করেও পঞ্চাশ লাখ টাকা চাই। কিন্তু করপোরেশন পেয়েছেন গত বছরে ১৯ লাখ ৮৯ হাজার টাকা। চলতি বছরের বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে ২০ লাখ টাকা। এভাবে চললে, করপোরেশনের বক্তব্য, ১৯৮৫ সালের আগে হলদিয়া শিল্প নগরীতে পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেয়ারম্যানকে বলেছেন, পূর্ত দফতরের একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার যদি বছরে ষাট থেকে আশি লাখ টাকার কাজ করতে পারেন, তাহলে বছরে মাত্র সত্তর লাখ টাকার কাজের জন্য করপোরেশন খুলে একটা হাতি পোষা কেন হচ্ছে। তুলে দিন।

চেয়ারম্যান মন্ত্রীকে বলেছিলেন সে কথা, কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় চেয়ারম্যানের কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেননি। অতএব, করপোরেশন যুগ যুগ জিয়ো।

আর জমি সংগ্রহের ব্যাপারে করপোরেশনের হাল যে কি শিল্প বাণিজ্য দফতর সম্ভবত তার কোন খোঁজই রাখেন না। রাখলে কখনো ওই পুস্তিকায় লিখতেন না যে, ফারাক্কা সাঁওতালডি—রাম কানালিতে করপোরেশন শিল্প নগরী গড়ে তুলেছেন।

প্রকৃত সত্য হল, ফারাক্কা ব্যারেজ অথরিটি, করপোরেশনের এক চিঠির জবাবে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, জমিটমির ব্যাপারে রাজ্য সরকার ছাড়া তৃতীয় কোন সংস্থার সঙ্গে কথাই বলবেন না।

পুরুলিয়ায় সাঁওতালডি, রামকানালিতে ভূগর্ভে জল নেই। তাই সুবর্ণরেখা নদীর কাছে ঝালদা থানায় তুলিনে জমি নেওয়া যায় কিনা এরকম একটা

কথা করপোরেশন অতীতে একবার ভেবেছিলেন মাত্র। ব্যস ওই পর্যন্ত। দুর্গাপুর, আসানসোলে করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঘুরে দেখতেও যাননি।

আর যে তিনটি এলাকা নিয়ে শিল্প বাণিজ্য দফতর ঢাক পেটাচ্ছেন, সেই কল্যাণী, খড়গপুর ও হলদিয়ার প্রকৃত সত্য হল : খড়গপুরে জায়গা নেওয়ার জন্য শিল্পপতিরা কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। হলদিয়ায় উন্নয়নের কোন কাজ হয়নি, তাই কেউ যাচ্ছেন না। আর কল্যাণীতে এ পর্যন্ত গুটি পাঁচেক বেসরকারী শিল্প সংস্থা জমি দেখে গিয়েছেন।

একে তো নয়া শিল্পনগরী গঠনের কোন কাজ এই সংস্থা করতে পারছে না, তার ওপর মূলত যে সংস্থার হয়ে এই কাজ তাঁরা করবেন সেই সহযোগী শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের তরফ থেকেও পাচ্ছেন না কোন সহযোগিতা। আই ডি সির কাছে টাকা ধার চেয়ে ছিলেন। আই ডি সি বলেছেন, শতকরা নয় টাকা হারে ধার দিতে পারেন।

এছাড়া আছে ঘরোয়া কোঁদল। নিত্য ঠোকাঠুকি। কাজের নামে শুধু অকাজ।

ওধারে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংকের ২৬ কোটি টাকা ঋণ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালে সি এম ডি এ-কে যে সাড়ে সাত কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে দিল্লী নতুন শর্ত আরোপ করেছেন। এর ফলে ওই সাড়ে সাত কোটি টাকার অনেকটাই হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

সি এম ডি এ-র এক মুখপাত্র বলেন, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেই ওই ঋণ নিয়ে ভারত সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল তাতে ২৬ কোটি টাকার সবটাই বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য দেওয়ার কথা। কিন্তু সম্প্রতি এই ধুয়ো তুলেছেন যে, এই ঋণ থেকে এ বছর (১৯৭৫) যদি সাড়ে সাত কোটি টাকা পেতে হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও 'ম্যাচিং গ্র্যানট' হিসাবে কম পরিমাণ টাকা নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ করতে হবে। আগে কেনা মাল মশলার হিসাবে ওই টাকা ব্যয় হয়েছে বলে দেখালে চলবে না, বাজার থেকেও ওই 'ম্যাচিং গ্র্যাণ্ট'-এর টাকা ঋণ তোলা যাবে না। অবশ্য আড়াই কোটি টাকা এ বছর পাওয়া গিয়েছে। বাকি পাঁচ কোটি টাকা তামাদি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এর পরেও যদি কেউ বলেন মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী—প্রভৃতিরা অযোগ্য তাহলে

তাকে বিশ্বনিন্দুকই বলা উচিত। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবশ্য রেকর্ড শিল্পের চেয়ে সামান্য কিছুটা ভাল। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ১৯৭১-৭২ সালের, অর্থাৎ যে সময় নতুন মন্ত্রিসভা রাজত্ব হাতে নিলেন সেই বছরের ধারে কাছে যেতে পারেন নি (১৯৬৯-এর জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যের সরকারী খাস জমির জেলাওয়ারী হিসাব) :—

জেলা :	পরিমাণ :
মালদহ—	৬৭০৫২ একর
পশ্চিম দিনাজপুর—	৫৮৮৯৩ „
বর্দ্ধমান—	১৪৭২৮ „
বাঁকুড়া—	৩১৯৪৪ „
চব্বিশ পরগণা—	৭৫৪৩২ „
মেদিনীপুর	২০০৯০৮ „
মুর্শিদাবাদ—	২১৯৯৯ „
বীরভূম —	১৩৫১৫ „
হাওড়া—	৩৫৭৭ „
হুগলী—	৮০৬৮ „
নদীয়া—	১৩০৪৪ „
কোচবিহার—	৪৫০৭৪ „
জলপাইগুড়ি—	৯৩৯৮০ „
দার্জিলিং	১৬৮২৪ „
পুরুলিয়া	৩৬৪৯২ „

এবং—

জোতের পরিমাণ	শতকরা কত পরিবারের হাতে
১ একরের নিচে—	১৫·৯০
১-২·৫ „	৩০·১২
২·৫-৫·০ „	২৬·২৮
৫·০-৭·৫ „	২৪·২২
৭·৫-১০·০ „	৪·৭১
১০·০-১২·৫ „	৩·৬১
১২·৫-১৫·০ „	১·৩৩

১৫'০-৩০'০ „	২'৬৪
৩০'০-৫০'০ „	০'২২
৫০ একরের উর্দ্ধে—	০'০৮

রাজ্যের ১৯৪৯-৫০ সালের মোট কৃষি উৎপাদনকে ১০০ ধরলে ১৯৭১-৭২ সালে আমাদের মোট কৃষি উৎপাদন দাঁড়িয়েছিল ১৮৪'২৬। আর ১৯৭৩-৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উৎপাদন হল ১৬৭'১৮। তবে, ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদন আরো কম ছিল ১৫৭'৬৯ মাত্র।

কিন্তু মোট কৃষি উৎপাদন ৭২-৭৩ সালের তুলনায় ৭৩-৭৪ সালে যে ভাবে বেড়েছে রাজ্যের খাদ্যোৎপাদন ঠিক সেভাবে বাড়েনি। ৪৯-৫০ সালের খাদ্য শস্য উৎপাদনকে ১০০ ধরলে ৭২-৭৩ সালে খাদ্য শস্য উৎপাদন ছিল ১৫৭'৪০, আর ৭৩-৭৪ সালের উৎপাদন হল ১৫৯'৫৭। নতুন মন্ত্রীসভা রাজ্যের শাসন ভার হাতে নেওয়ার সময় খাদ্য শস্য উৎপাদন ছিল ১৮৪। নিশ্চয়ই তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়েছে। অবশ্যই সামনের দিকে নয়।

আজ আমি একা। সকলের মধ্যে থেকেও আমি একা। যদিও সকলে, আমার পরিচিত জনেরা আমার কাছেই রয়েছে, আমার কাছে আসে, কথা বলে, কিন্তু আমি নিজে থেকে তাদের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারিনা। কেউ আমাকে তাদের মধ্যে ডাকেও না। কেন ডাকে না বুঝতে পারি। ভয়ে। আর সেই জন্যেই আমি রাগ করতে পারি না কারো ওপর।

ডাক্তার আমার বিশ্রামের উপদেশ দিয়েছেন। আমি যাতে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম সুখ উপলব্ধি করতে পারি সে কথা বলেছেন। কোন কারণেই আমাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। এবং তাহলেই আমি কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবো। আবার আমি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবো। আমার দিনগুলি আবার সহজ সুন্দর হয়ে উঠবে।

হবে কি? ডাক্তারের কথাগুলো আমি শুনেছি। আমাকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে শুনিয়ে মেজদাকে কথাগুলো বলছিলেন ডাক্তার। বুঝতে পেরেছিলাম মেজদাকে নয় কথাগুলো তিনি আমাকে শোনাচ্ছেন।

মেজদা আমাকে তার কর্মস্থল টাটায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি।

মেজদা বলেছিল, 'অন্তত কদিনের জন্যে ঘুরে আসবি চল।'

—'কেন ?' প্রশ্ন করে ছিলাম আমি। মেজদা উত্তর দিতে পারেনি। যদিও আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মেজদা কেন আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কি লাভ তাতে ? আমার যা গেছে তাকি আমি ফিরে পাব আর কোনদিন। কেউ কি আমাকে আর বিশ্বাস করবে আগের মত ? জেল খাটা আসামী ঘৃণা আর অনুকম্পার পাত্র! আমাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি জানি আমি কোন দোষ করিনি। কিন্তু অন্যেরা ? নিশ্চই বিশ্বাস করবে না।

আর সেই জন্যেই আমি মায়ার মুখের ওপর দরোজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তবু মায়া যায়নি। আমাদের বাড়ির কারো কাছে নিশ্চই আমার কথা শুনে থাকবে। এমন হওয়া আশ্চর্য নয়, আমাদের বাড়ি থেকেই ওকে খবর দিয়ে এনেছিল। হয়তো বা আমি না থাকার দেড়টা বছরে আমাদের পরিবারের আমাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনার একজন অংশীদার হয়ে উঠেছে। আমি বাড়ি ফেরার পরদিনই ও এসেছিল। দরোজা বন্ধ করতে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমার নাম ধরে ডেকেছিল।

আমি সাড়া দিইনি। ওর দিকে চাইনি। ও বলেছিল, 'আমি কি চলে যাব ?'

তবু আমি কথা বলিনি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কষ্ট হয়েছিল আমার।

মায়া জিজ্ঞাসা করেছিল, 'দরোজা খুলবে না ?'

ওর দিকে না ফিরে বলেছিলাম, 'না।'

—'কেন ?'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার। ইচ্ছা করেছিল দরোজটা খুলে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই পান পাতার মত মুখটার শ্যামলা গালে। নিশ্চই পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে উঠবে দেখতে দেখতে। আর যাতে আমার কাছে না আসে তার ব্যবস্থা করি। কিন্তু নিজেকে সংযত করেছিলাম। আমার লজ্জা করছিল। কষ্ট হচ্ছিল। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার ভয় হচ্ছিল।

ও চলে গিয়েছিল এক সময়। চলে যাবার পর বড় খারাপ লেগেছিল। বড় কষ্ট হয়েছিল। দেড় বছরের জেলখানা ভোগের সময় কম অত্যাচার হয়নি আমার ওপর, কিন্তু মায়ার সঙ্গে দেড় বছর পরে দেখা হওয়ার প্রথমদিনে ও চলে যাওয়ার পর যে কষ্ট হয়েছিল; সে কষ্ট কখনো পাইনি। জেলখানার

অত্যাচার ছিল পৈশাচিক। পরে কিছু মনে থাকতো না।

আর কষ্ট পাই তখন, প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরই কানে এসে পৌঁছায় করুণ আর্তনাদ, 'মা, একটা বাসী-রুটি দাওনা মাগো।' প্রতি দিন। একের পর এক। কলকাতার গৃহস্থরা গ্রাম গঞ্জের অনাহারী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চাদের জন্যে যেন রুটি তৈরী করে রেখেছে। আগেও শুনেছি কিন্তু এখনকার মত কষ্টের অনুভূতিটা এমন তীব্র ছিল না। শুনেছি আগে দুর্ভিক্ষ মহামারীর সময় এমন হয়েছে—এখন কি নিত্য দুর্ভিক্ষ লেগে আছে! তা যদি না হবে, এ আকৃতির শেষ হচ্ছে না কেন? কোনদিন শেষ হবে কি?

কারণ অনেক। তার মধ্যে :

কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ এক নয়। তাই রাজ্যের অন্য এলাকা অবহেলিত রেখে কেবল কলকাতার উন্নয়নের জন্যে টাকা খরচ করলে, রাজ্যের অন্য এলাকার সমস্যা আরো জটিল হবে, শিক্ষিত বেকার ও গ্রামের গরীবরা মহানগরীতে এসে আরো ভিড় করবে। সি এম ডি এর মাধ্যমে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে তাই কলকাতায় বহিরাগতের ভিড় বেড়েছে এবং এই ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকবে। যেহেতু বস্তি ফুটপাত ও রেল লাইনের পাশে ঘর করে বসবাসকারীরা গ্রাম থেকে আসে সেহেতু অনেকেরই ধারণা কৃষির উন্নয়নের জন্য আরো টাকা খরচ করলে উন্নত কৃষি গ্রামাঞ্চলেই ওই সব লোকের কাজের ব্যবস্থা করবে এবং তখন ওরা আর এই শহরে এসে ভিড় করবে না। এ-রাজ্যের কৃষির ওপর আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, নতুন শিল্পও গড়ে উঠছে না। ফলে গ্রামে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

১৯৬১ সালে মোট চাষী পরিবারের শতকরা ২৮·৪ ভাগ ছিল ক্ষেত মজুর পরিবার। ১৯৭১ সালে ক্ষেত মজুর পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল শতকরা ৪৫.৩ ভাগ। চাষবাসের ব্যয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বৃদ্ধি, বন্যা-খরা এবং কৃষক পাট প্রভৃতি কৃষি-জাত দ্রব্যের উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় গত তিন বছরে এই ক্ষেত মজুরের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রাণ কার্যের মাধ্যমে সরকার গ্রামাঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু ঠেকাতে চেয়েছেন। এর জন্যে ব্যয় হয়েছে :

১৮৬৮-৬৯ সালে—১২·৬৮ কোটি টাকা

১৯৬৯-৭০ ”—৮·৪৭ কোটি টাকা

১৯৭০-৭১ ” –১১·২৯ কোটি টাকা

১৯৭১-৭২ "—১৭'৩৯ কোটি টাকা

১৯৭২-৭৩ "—১৬'৮৪ কোটি টাকা

১৯৭৩-৭৪ "—৯'১৫ কোটি টাকা

১৯৭৪-৭৫ " (প্রথমে ৮ মাসে ১৭ কোটি টাকা

এতটাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। উন্নত হচ্ছে কলকাতার, গ্রাম সেই গ্রামই আছে। বরং যত দিন যাচ্ছে গ্রামের অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। পেটের জ্বালায় খাদ্যের সন্ধানে মানুষ ছুটে আসছে সহরে। কিন্তু কি পাচ্ছে তারা? ভিক্ষা করে মেয়েরা দেহ বিক্রী করে কত দিন ক্ষুধার অন্ন জোগাবে?

বর্তমান মন্ত্রীসভার তিন বছর পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে সাংবাদিকের কলম (২৫.৩.৭৫), গত সপ্তাহে মন্ত্রীসভার তিন বছর পূর্ণ হয়ে গেল। এর আগের বছরপশ্চিম বাংলা সরকার সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে ছিলেন, তাঁরা এরাজ্যের অগ্রগতির জন্য কী করেছেন। এবার বিজ্ঞাপনের বদলে তাঁরা ইংরাজি ও বাংলায় পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কর্তব্যের তাগিদে এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে; আজ যখন আমাদের কার্য কালের তথা পুনর্গঠনের কাজের তৃতীয় বছর পূর্ণ হল তখন আমরা কি করতে পেরেছি তার মূল্যায়ন করা এবং জনগণের সঙ্গে সমস্ত সাফল্যের অংশীদার হওয়া আমাদের কর্তব্য।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই হোক বা পুস্তিকা প্রকাশ করেই হোক, এই বাৎসরিক কর্তব্য পালনের একটি মাত্র কারণই হতে পারে। পশ্চিমবাংলা সরকারের সন্দেহ, এ রাজ্যের জনসাধারণ তাঁদের দুর্দশা নিরসনের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের নবরুপায়ণের জন্য বর্তমান মন্ত্রীসভা কী করেছেন সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন। যদি পশ্চিম বাংলার সাধারণ নাগরিক তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে এই প্রচেষ্টার প্রতিফলন অনুভব করতেন তাহলে এই পুস্তিকা প্রকাশের প্রয়োজন হত না।

এই পুস্তিকা পাঠ করে এরাজ্যের শিক্ষিত জনসাধারণ (দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে গান্ধীর বেসিক এডুকেসন বা বুনিয়াদী শিক্ষায় বালক বালিকাদের শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করার কর্মসূচী ছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের নির্দেশক নীতির একটি ধারায় ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রীয়

দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশে নিরক্ষর জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

১৯৫১ সালে এদেশে মোট জনসংখ্যা যা ছিল, ১৯৭১ সালে নিরক্ষরের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। ৫ বছরের কম ছেলে মেয়েদের সংখ্যা বাদ দিলে ভারতে নিরক্ষর জনসংখ্যার পরিমান ২৮ কোটির মত। এবং বিদেশে ভারতের একটা পরিচয় কেবল গরীব দেশ বলে নয়, সবচেয়ে বেশি নিরক্ষর জনসংখ্যার দেশ বলেও। ভারতে সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ২৯·৩৫ জন বলে মহাদেশ হিসাবে এশিয়ায় সাক্ষরের শতকরা হারও কম ৪৬·৮।

পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা দীর্ঘ কাল যাবৎ শিক্ষার কেন্দ্র থাকলেও ভারতের অপেক্ষাকৃত বেশি সাক্ষর রাজ্যগুলির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ক্রমেই নীচের দিকে নামছে।

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়। ১৯৬১ সালে নবম এবং ১৯৭১ সালে দ্বাদশ। সাক্ষরতার দিক দিয়ে কলকাতার স্থান এদেশের শহর-গুলির মধ্যে অনেক নীচে। সাক্ষরতার মাপকাঠিতে এই ৪২তম শহরের সাক্ষরের হার ১৯৭১ সালে ছিল শতকরা ৬০·৩৫ ভাগ।

২১ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত এদেশে নিরক্ষরতা দূর করার কোন ব্যবস্থা নেই। রাজ্য সরকারের ব্যবস্থা অনুসারে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরকরার নৈশ বিদ্যালয় পিছু মাসিক বরাদ্দ পাঁচ টাকা। শিক্ষকদের বেতন মাসিক দশটাকা। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে মায়া বা মতিভ্রম মনে করবেন একথা অবিশ্বাস্য। তবে রাজ্য সরকারের বিশ্বাসে বাদ সাধা কারও সম্ভব নয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন 'সত্যমেব জয়তে' এবং সে-সত্য নিহিত সরকারী ফাইলে ও পরি সংখ্যানে।

সাফল্যের ফিরিস্তি স্বরু করার আগে সবিনয় নিবেদন, আরও অনেক কিছু করা যেতো, কিন্তু করা যায়নি। আমরা কিছু কিছু ভুল করেছি এবং আমাদের ব্যর্থতাও যে নেই এমন নয় (হয়তো অদূরে লোক সভা এবং বিধান সভায় নির্বাচন সেই জন্যেই এই স্বীকৃতি)।

এই মন্ত্রীসভা গত তিন বছরে এ-রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কিছু করেননি বা উন্নতি সাধনে তাদের কোন চেষ্টা নেই, এ অভিযোগ মন্ত্রীসভার কঠোর সমা-লোচকও কখনো করেননি। কোন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধেই এই ধরণের ঢালাও অভিযোগ আনা চলে না। বর্তমান মন্ত্রীসভার সম্পর্কে অভিযোগ, তাঁদের প্রচেষ্টা

প্রয়োজন অনুযায়ী নয় এবং সাফল্য প্রচেষ্টা অনুযায়ী নয়।

প্রথমটির জন্য দায়ী তাঁদের আত্মতুষ্টি, দ্বিতীয়টির জন্য প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব।

তুলনামূলক বিচার ছাড়া কোন কিছুরই প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয় এবং এই মূল্যায়ন পুস্তিকাটিতে করা হয়নি।

যেমন বেকার সমস্যা।

মুখবন্ধে বলা হয়েছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সর্বক্ষেত্রেই অমরা নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছি। তাঁর তথ্য অনুযায়ী এ রাজ্যে গত তিন বছরে গড়ে প্রতি বছরে শহরাঞ্চলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোকের কর্মসংস্থান করতে পেরেছেন। ধরে নেওয়া যাক এই এক লক্ষ্য কুড়ি হাজার চাকরিই নতুন এবং তারা কোন না কোন রকমের উৎপাদন মূলক কাজে নিযুক্ত আছেন। তা সত্বেও পশ্চিম বাংলা সরকার অস্বীকার করতে পারবেন না যে, রাজ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। তার অর্থ প্রতি বছর রাজ্য সরকার যত চাকরি সংস্থান করছেন, নতুন চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। এই হাবে যদি চাকরি সংস্থান হয় তাহলে বেকার সমস্যা সমাধান তো কোনদিনই হবে না, বরং বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়বে (এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, কর্মপ্রার্থী বেকারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেই বেশি)। ১৯৭২ সালের জুন মাসে সারা ভারতে কর্মপ্রার্থী বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৬ লক্ষ ৮৮ হাজার, ১৯৭৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ লক্ষ ৯৬ হাজার। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৩·৫ শতাংশ। এদের মধ্যে ১৯৭২ সালে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা, ২৬ লক্ষ ১১ হাজার এবং ১৯৭৩ সালে ৩৫ লক্ষ ২৯ হাজার। এক বছরে প্রায় ৯ লক্ষ পরিমাণ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যা বৃদ্ধি ২ লক্ষ ৪০ হাজার।

১৯৬৫ সাল থেকে এই রাজ্যে কর্ম সংস্থানে কি হাল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের অন্য এক তথ্য থেকেও জানা যায়। যথা—

বৎসর	এম্প্লয় এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কর্মলাভের সংখ্যা (হাজার)
১৯৬৫	৫৩·১
১৯৬৬	৪৪·৯
১৯৬৭	৩৩·১
১৯৬৮	৩২·৮

১৯৬৯	২৬·১
১৯৭০	২০·৩
১৯৭১	২০·১
১৯৭২	২৩·০

পশ্চিমবঙ্গে চাকরির বাজারে কি হারে মন্দা বাড়ছে চিন্তা করলে শিউরে উঠতে হয়। ১৯৬৫ সালে ৫৩ হাজার চাকরি, ১৯৭২ মালে ২৩ হাজারে পৌছেছে। এদিকে ষ্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের তথ্য প্রকাশ—এই বছর পশ্চিমবঙ্গে চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ। সি. এম. পি. ও. আর এক হিসাবে প্রকাশ করেছেন ঐ একই বছরে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। এবং শ্রমমন্ত্রীর তথ্য (৩১, ১, ৭৫ তারিখে) পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ১৬,৪১,৯৪৭। কলকাতায় ১,৯৪,৪৮৮ ও দুর্গাপুরে ১,৭৪,০২১।

কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশ জুড়ে ভয়াবহ বেকার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটা কার্যক্রম নিয়েছিলেন। ওই কার্যক্রমের নাম 'অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কার্যক্রম'—Additional Employment Programme। এটি স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান পরিকল্পনা; এই কার্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়েছিল এক লক্ষ বেকার যুবকের কর্মসংস্থান। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৩ সালে অনুদান দিয়েছিলেন ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেয় ৫৬ লক্ষ টাকা। মোট ৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকায় ১ লক্ষ বেকার যুবকের কর্ম সংস্থান হবে এমন একটা কার্যক্রম ছিল। এই কার্যক্রমে জানা যায় যে, সরকারী অনুদানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের সহায়তা যুক্ত থাকবে এবং শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী বেকারেরা এই কার্যক্রমের সাহায্যে স্ব-নির্ভর জীবিকা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সরকারী এষ্টিমেট কমিটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের রিপোর্ট (১৯৭৪-৭৫) প্রকাশ করেছেন। এদের তথ্যে প্রকাশ, ৮ কোটি টাকার অর্ধেক মাত্র খরচ হয়েছে। কিন্তু কতজনের কর্মসংস্থান হয়েছে তা সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তাঁরা এটুকু বলতে পারেন, প্রত্যাশিত এক লক্ষের অনেক নীচে রয়েছে ওই সংখ্যা। এবং ১৯৭৩ সালের অর্থিক বছরে গোড়ার দিকে যে স্কীম চালু করার কথা, সেই স্কীমের কাজ ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয়। অবশ্যই কাজ চলেছিল আমলাতান্ত্রিক রিতি অনুযায়ী-অত্যন্ত ঢিমেতালে। অবশ্য সরকারী মত ভিন্ন। তাঁদের মতে স্কীমের কাজ নাকি পরিকল্পনা মতই চলছে। কিন্তু এষ্টিমেট

কমিটির তথ্যে জানা যায়, বাজেটের (১৯৭৪-৭৫) আগে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৯৬০০ টি কর্মসংস্থান কার্যক্রমের মধ্যে মোট ৫৬০ টি অনুমোদন লাভ করেছে। এবং এষ্টিমেট কমিটির আরো তথ্য যে, ব্যাঙ্কের বড়-বাবুরা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ন্যায্য পাওনা হিসাবে নতুন শিল্পোদ্যোগীদের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করছেন।

পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রগঠন মূলক কার্য কলাপের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে ধান উৎপাদনের একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সত্যই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বা এ রাজ্যের প্রয়োজন অনুসারে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পর্য্যাপ্ত কিনা সে প্রশ্নের বিচার থাক। কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও মন্ত্রীসভা কেন আশানুরূপ ধান চাল সংগহ্ করতে পারছেন না। কেন বিধি বদ্ধ রেশন এলাকায় সাপ্তাহিক চালের বরাদ্দ ৫০০ গ্রামে দাঁড়িয়েছে (ধান এবং কাঁকর হিসাবে বেশ কিছুটা বাদ যায় এর থেকে), কেন আংশিক রেশন ব্যবসায় চাল দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এসব প্রশ্ন অবান্তর নয়। ভুক্তভোগী মাত্রেই সরকারী পরি সংখ্যানের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করবেন, না হয় এই পরিসংখ্যানকে মন্ত্রীসভার অকর্মণ্যতার পরিচায়ক হিসাবে গণ্য করবেন।

পুস্তিকায় আরো বলা হয়েছে, অর্থনীতির বলিষ্ঠতা ও স্থিরতা অর্জনের নিদর্শন হচ্ছে কর সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। একটি হিসাবে দেখা যায় সমস্ত রাজ্যকর বাবদ পশ্চিম বাংলায় সংগ্রহ ১৯৬৬-৬৭ সালে ছিল ৯৯ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ এই সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২৫ কোটি টাকা। নতুন কর ধার্য করলে সরকারী আয় বৃদ্ধি স্বাভাবিক। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য বৃদ্ধির জন্যও কর বাবদ আয়ের বৃদ্ধি হয়েছে।

১৯৭১-৭২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর বাবদ আয় হয়েছিল ৫,৫৭৫ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালে বাজেট হিসাব অনুসারে এই আয় ৮০১৩ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। কাজেই কর বাবদ আয় বৃদ্ধি নিশ্চয় পশ্চিমবাংলা বৈশিষ্ট্য নয়। এই বৃদ্ধি যদি অর্থনীতির বলিষ্ঠতা ও স্থিরতার পরিচায়ক হত তাহলে মেনে নিতে হয় দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক সঙ্কট নিয়ে এত ভাবনা ও আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

মন্ত্রীসভার দায়িত্ব শুধু মাত্র উন্নয়ন নয়, যাতে রাজ্যের সাধারণ নাগরিক এই উন্নয়নের ফল ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও মন্ত্রীসভার অবশ্য কর্তব্য। তাঁরা যে পরিসংখ্যান পেশ করেছেন তাতে এই দ্বিতীয় কর্তব্যের কোন উল্লেখ

নেই। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে এই দ্বিতীয় কর্তব্যটির গুরুত্ব সম্বন্ধে মন্ত্রীসভা অবহিত নন, তাঁরা জানেন না যে দ্বিতীয় কর্তব্যটি পালন করতে না পারলে সাধারণ নাগরিক বিশ্বাস করবেন না যে প্রথমটি তাঁরা পালন করেছেন।

ইংরাজী বাংলায় প্রকাশিত পুস্তিকাতো পড়বেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। নিরক্ষর সংখ্যা গরিষ্ঠের কাছে ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়া না হওয়া দুই-ই সমান। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই মন্ত্রী সভায় বিচার করেন। যে অল্প সংখ্যক নাগরিক এই পুস্তিকা পাঠ করবেন তাঁদের কাছেও সেচ, সার বিলি, উৎপাদন ইত্যাদির ক্রমোন্নতি অর্থবহ হবে না, যদি না দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা এই উন্নতির সুফল অনুভব করেন।

বড় বউদি এইমাত্র আমার সামনে থেকে চলে গেল। চলে যাবার আগে আমাকে স্নান করার তাড়া দিয়ে গেল। প্রায় দশটা বাজে। এরই মধ্যে ফাল্গুনের রোদ বেশ তেতে উঠেছে। আজ বাড়িতে আমরা মাত্র তিনটে প্রাণী। আমি বড় বউদি আর ললনা। বাড়ির বাকি সকলে মেজদার শালার বিয়েতে নিমন্ত্রণে গেছে গতকাল বিকাল বেলা। বড় বউদির বাইরে খাওয়া নিষেধ বলে কোথাও যায়না। ললনার ফাইন্যাল পরীক্ষা আর ক'দিন পরেই। ও নিজেও যেতে চায়নি। আমাকে যাবার কথা বলা হয়েছিল একবার। আমি কানে তুলিনি সে কথা।

গতরাত্রে অনেক সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম। তখন দশটাও বাজেনি। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল শেষ রাতে। আমার ঘড়ি নেই, তাই সময় দেখতে পাইনি। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রাতের তারা দেখে সময় হিসাব করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম কিছুক্ষণ, বিরক্ত হয়ে ঘরে চলে গিয়েছিলাম। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে পুরো এক গ্লাস জল খেয়েছিলাম। তারপরই একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা করেছিল। যে কোন সিগারেট। বহুদিন পরে সিগারেট খাওয়ার কথা মনে হয়েছিল।

সিগারেটে আমি কোন দিনই পোক্ত নই। স্কুলে পড়ার সময় কখনো কখনো লুকিয়ে বিড়ি সিগারেট খেয়েছি। কলেজ লাইফে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে খেতে হ'ত। যদিও ওরা তখন বিড়ি মদ টদ খায়। দিশিও খায়। ক'দিন আগে মেজদা বলছিল, বাবরী চুল, জুলফি রাখার মত মদ খাওয়াটাও

এখন ছেলে ছোকরাদের রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। মদ খাওয়াটা নাকি অন্যায় অশোভন ব্যাপারের মধ্যে পড়ে না। তরুণ ছেলেরা মদ খাবে এটা এখন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ছাড়া আরো কিছু ওষুধ খুবই চালু হয়েছে এখন।

কথাগুলো কানে এসেছিল আমার। শুনেছিলাম শুধু। কিছুই মনে হয়নি আমার। সিগারেট খেতাম বাণীর জন্যেই। মাঝে মাঝে আমরা দুজনে কোথাও বেড়াতে গেলে, ও কখনো সখনো খুবই দামী সিগারেট আমাকে খাওয়াতো। ও বলতো ওর নাকি সিগারেটের গন্ধ খুবই ভাল লাগে। ওকে সিগারেটের গন্ধ শোঁকাবার জন্যে সিগারেট খেতে হত আমাকে। অবশ্য দামী সিগারেট টানতে আমারও যে খুব একটা খারাপ লাগতো তা নয়।

কিন্তু ঘুম ভাঙ্গা শেষ রাতে আমার নিজেরই খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছা করেছিল। ন'দা সিগারেট খায়। ওর ঘরে বেশ কিছু সিগারেট সব সময় মজুত থাকে। ও যদি বাড়িতে থাকতো তাহলে ওকে ডেকে নিশ্চয়ই একটা সিগারেট চেয়ে খেতাম। ও অবশ্য কিছু মনে করতো না। আমরা দুজনে বয়সের ব্যবধানে খুবই কাছাকাছি। আগে অনেক সিগারেট খেয়েছিও দুজনে।

সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছাটা এক সময় কমে গিয়েছিল। শুতে ইচ্ছা করেনি আর। জানলার ধারে চেয়ারটায় বসে ছিলাম। বাইরে রাত্রি। ভোর হয়ে আসছে। সমস্ত দিনে রাতে কলকাতার রাস্তার কতটুকু সময় লোক চলে না— জানিনা। দেখেছিলাম। লোক চলাচল করছে। গলির মোড়ে বড় রাস্তা থেকে গাড়ি চলার আওয়াজ আসছে।

হঠাৎ আমি জামাটা গায়ে দিয়েছিলাম। আমরা দোতলার বাসিন্দা। যাতায়াতের আলাদা রাস্তা। নীচে নেমে আমি বাইরের দরোজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

হাঁটতে শুরু করে ছিলাম। কোথায় যাব জানিনা। প্রায় নির্জন পথ। বিক্ষিপ্ত ভাবে দু একটা মানুষ। একটা দুটো লরী। কখনো এক আধটা ট্যাক্সি। পুলিশ। ঠেলা। কুকুর। আগের দিন হলে রাস্তা ধোওয়া সুরু হয়ে যেত এতক্ষণে। সে দিন কবে শেষ হয়ে গেছে জানিনা।

মন্দ লাগেনি। একা একা হাঁটতে ভালই লাগছিল। বেশ নতুন-নতুন। যদিও কখনো কখনো একটু ভয় করছিল। কারণ এভাবে কখনো বেরুইনি।

আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ছিল। মানুষভর্তি ফুটপাত। এমন কখনো দেখিনি। আগেও অবশ্য ছিল। ফুটপাতের বাসিন্দারা বোধহয় চির-

দিনই আছে। কিন্তু এমন ভর্তি ছিল কিনা মনে করতে পারি না (সি. এম. ডি-এর সমীক্ষা থেকে জানা যায়, কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে দু'লক্ষ বাস করে ফুটপাতে। আর বাইশ লক্ষ হচ্ছে বস্তিবাসী। এবং তাদের আগমন নাকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চাকরির খোঁজে—চাকরি পেলে ভাল, না পেলে ভিক্ষাবৃত্তিই একমাত্র জীবিকা। সংবাদে প্রকাশ এদের সংখ্যা নাকি ক্রমশঃ বাড়তির দিকে)।

দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। ঠিক ভাবছিলাম না, অবাক হচ্ছিলাম। কি সুন্দর ভাবে এরা—ফুটপাত বাসীরা, মেয়ে পুরুষ, বুড়ো বাচ্চা মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। প্রকাশ্য রাজ পথে মুক্ত আকাশের নীচে কি সুন্দর এদের জীবন! বেঁচে থাকার কোন সমস্যাই যেন আর সমস্যা নয় এই সব মুক্ত নারী পুরুষ শিশুদের কাছে। এবং এরাও ভারতবর্ষের নাগরিক। আচ্ছা এদের কি ভোটের অধিকার আছে?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কেমন উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম। জানার প্রবল ইচ্ছা জেগে ছিল মনের মধ্যে। কিন্তু কি করে জানা যায় ভেবে পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ সুযোগ ঘটে গেল। দূর থেকে লক্ষ পড়ল একটা লোক বসে যেন কি করছে। জায়গাটা একটু আবছা আলো ছায়ায় ভরা। কাছে গিয়ে দেখলাম একটা লোক, তার আশে পাশে অনেক লোক, সকলেই ঘুমাচ্ছে। বুড়ো শোবার জায়গার পাশে বসেই প্রসাব করছে। আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে একটু থম-মত খেল।

কথাটা কিভাবে বলা যায় এক মুহূর্ত ভেবে নিয়েই বললাম, 'দেখ ভাই!'

শীর্ণ বুড়োটা আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাইল।

—'ক্যা নাম তুমহারা?' জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

—'হুঁজুর।' সে যেন ভয় পেয়েছে বা অবাক হয়েছে আমার প্রশ্নে।

—'নাম বোল।'

—'লছমন।'

—'মূলক?'

—'ছাপরা।'

—'তুমহারা ভোট হ্যায়'?

—'ভোট ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ ভোট দিয়া নেহি ?'

—'ওতো দেবে কারে ?'

—'কিসকো দিয়া থা ?'

—'হুঁজুর !'

– 'বোলতা কিসকো ভোট দিয়া থা ?'

—'আপ হুঁজুর জিসকো বলিয়ে গা ? আপকোই দেশকতা।'

—'নেহি নেহি হামরা দরকার নেই হ্যায়।'

—'তব ঔর কিসকো দেগা ?'

কথাটা শোনার পর এগিয়ে চললাম। আলো ফুটছে। কলকাতা জাগছে। দু' চারজন করে লোক বাড়ছে পথে। দু' একখানা গাড়ি। ঠেলা। রিকসা।

যেখানে গিয়ে থামলাম, সেটা আমাদের পুরানো পাড়া। সেই বাড়িটাব সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু চিনতে পারলাম না সেই বাড়িটাকে। পুবানো পাড়াটা আছে—পুরানো বাড়িটা নতুন হয়েছে। 'সুরেখা' ভবন। বংশী নন্দনেব বাড়িটা সুরেখা ভবন হয়েছে। এবং কয়েক লাখ টাকা পেয়ে ভাডার টাকায় সংসাব চলতো যে লোকটার সে নিশ্চই মফস্বলে কোথাও গিয়ে ছোট খাট একটা বাড়ি করেছে, মেয়েদের বিয়ে না হয়ে থাকলে বিগে দিয়েছে। মন্দ কি। কলকাতার বুকে পুরানো ঠাকুরদার আমলের তৈরি বাড়ি, যে বাড়িঁতে কোন দিন চুনকাম পর্যন্ত হয়নি, আঁকড়ে ধরে থেকে লাভ কি ? সুবেখারা কি সুন্দর ভাবে গড়ে তুলেছে সেই কম আলো বাতাস ঢোকা বাড়িটাকে। শুধু অর্থ নয় রুচিও আছে সুরেখাদের।

তবু পুরাতন স্মৃতিটা মনে পডতে মনটা একটু খাবাপ হয়ে গিয়েছিল। এক জনের কথা মনে পড়েছিল। একটা অলিখিত ইতিহাস। আচ্ছা গায়ত্রী প্রসন্নের সারা জীবনেব সংগ্রহ করা সেই সব মূল্যবান ইতিহাসের বইগুলোর কি হল ? সেগুলো কোথাও আছে, না লোকটা মবার সঙ্গে সঙ্গে মুদীব দোকানে স্থান পেয়েছে ?

বেশ একটু বেলা হয়েছে। বাড়ির কথা মনে পড়ল আমার। বড় বউদি আর ললনার কথা। ওরা নিশ্চই আমাকে না দেখে ভাবছে। ভাবছে কি ? তবু আমি বাড়ির পথেই ফিরলাম। এবং গলির মোড়েই দেখা হয়ে গেল ললনার সঙ্গে।

ললনা আমাকে দেখতে পেয়েই বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। আমি ডাকলাম। ও ধরা পড়ে গিয়ে কাছে আসতে বললাম, 'কোথা এসেছিলি ?'

ওর চোখে মুখে স্পষ্ট চিন্তার ছাপ। সত্যি কথাটা বলতে যেন বাধছে ওর।

বললাম, 'আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিস।'

ও অস্বীকার করল না। মাথা নাড়ল।

বললাম, 'খুব ভাবছিলি তোরা ?'

—'আমি নয়।' কথা বলল মেয়েটা।

—'বউদি ভাবছিল ?'

—'হ্যাঁ। জেঠিমা কেঁদে ফেলেছে।'

—'আমি কোথাও চলে গেছি ?'

ললনা মাথা নাড়ল। জানাল সত্যিই তাই।

হঠাৎ চা খাওয়ার কথা মনে হল আমার। যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম আমরা তার সামনেই পাড়ার চায়ের দোকান। এ দোকানে এসে অনেকদিন সকালে চা খেয়ে গেছি আমি। বললাম, 'হ্যাঁরে, তোর কাছে পয়সা আছে ?'

ললনা বলল, 'জেঠিমা একটা টাকা দিয়েছে ডিম কিনে নিয়ে যাবার জন্যে।'

বললাম, 'আয় আমার সঙ্গে তাহলে।'

সামনের চায়ের দোকানটায় আমরা ঢুকলাম না। বড় রাস্তা পার হয়ে একটু এগিয়ে একটা বড় আর ভাল চায়ের দোকান আছে। ললনাকে সঙ্গে নিয়ে সেই দোকানে গেলাম।

দোকানে ঢুকতে বাঁ পাশের কেক বিস্কুট রাখার শো কেসটায় রাখা ঘড়িটায় প্রায় সাতটা বাজে। দোকানের সামনে কিছু ছোকরা দাঁড়িয়ে জটলা করছে। ভেতরে প্রায় হল ঘরের মত দোকানটার অনেকগুলো টেবিল চেয়ার ভর্তি। অনেকেই দেখল আমাদের। অবশ্য ললনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি কেউ দিল না। কারণ মেয়েটা কম বাড়ন্ত। প্রায় ষোল বছর বয়েস। কিন্তু এই বয়েসের মেয়েদের মত বিশেষত্ব ওর নেই বললেই চলে। রোগা. একটু লম্বা। চোখে চশমা। গায়ে কমদামী ফ্রক। ওর মায়ের শাসন।

এবং ওর দিদিও ঠিক এ বয়েসে এমনই ছিল। শুধু লেখাপড়ায় সেটা ভাল ছিল না। ওর মাও বিয়ের সময় বেশ রোগা ছিল। ওর মায়ের মত ওর দিদিও বিয়ের পর স্বাস্থ্য পেয়েছে। ললনাও নিশ্চই তাই পাবে।

বয়টা আসতে চা আর বিস্কুট দিতে বললাম। ললনাকে বললাম, 'তোর ডিমের পয়সায় কিন্তু চা খাব আমরা।'

ও বলল, 'আমি পরে এসে ডিম কিনে নিয়ে যাব।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, লনা!'

ও আমার মুখের দিকে চাইল।

বললাম, 'মনে কর আমি যদি না ফিরতাম আর?'

ও একটু চুপ করে রইল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি জানতাম তুমি ফিরবে।'

—'ধর ফিরতেওতো না পারি?'

—'কোথায় যাবে?'

কথাটা শুনে বুকের মধ্যেটায় যেন আঘাত লাগলো। সত্যিই তো যাব কোথায়? আমার যাবার মত কোন জায়গা তো নেই। কোন্ ভরসায় আমি যেতে পারি।

বললাম, 'আমাকে তোর ভয় করে?'

—'না।'

—'সত্যি কথা বলছিস?'

—'কেন, ভয় করবে কেন?'

—'আমি যে পাগল হয়ে গেছি।'

ললনা হেসে ফেলল। হেসে ফেলেই অপ্রস্তুত হল। অপরাধী কণ্ঠে বলল, 'ছোটকা, চা তোমার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

চায়ে চুমুক দিলুম আমি। বয়টাকে ডেকে পয়সা দিল ও। কুড়িটা পয়সা ফিরত থেকে দশটা পয়সা বয়টাকে বকশিস দিল। বয়টা কিন্তু পয়সা নিয়ে হাত তুলল আমাকে।

ললনা সেটা লক্ষ্য করেছে বুঝতে পারিনি আমি। বাইরে বেরিয়ে বলল, 'ছোটকা বয়টার আক্কেল দেখলে। পয়সা দিলুম আমি, সেলাম দিলে তোমাকে।'

বললাম, 'যেতে দে।'

হঠাৎ ললনা বলল, 'সিগারেট খাবে ছোটকা, দাঁড়াও আনছি।'

কথাটা বলেই পান বিড়ির দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল ও।

সেই শেষ রাত থেকে আজ অজস্র টুকরো-টুকরো ঘটনা। যেন দৃশ্য পট। একের পর এক। একেই বোধহয় ট্রেলর বলে। আসল বই শুরু হওয়ার আগে এমনই চলে। তাই চলেছে আজ। তারপর শুরু হয়েছে কাহিনী। মায়া এসে সোজা আমার ঘরে ঢুকেছিল। প্রশ্ন করেছিল। উত্তর দিয়েছি। ও চলে গেছে এক সময়। খুশি হয়ে গেছে কিনা জানিনা। জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন অনুভব করিনি। কিন্তু আমি আজ অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত লনার সঙ্গে গল্প করেছি।

কিন্তু এখন আমার মনে অনেক চিন্তার ভিড়। অজস্র প্রশ্ন। প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন, আর আমার পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব কি? বোধ হয় নয়। হবে কি করে? শুনেছি বাদ্য যন্ত্রের তার ছিঁড়ে গেলে নতুন তার বাধা হয়, কিন্তু আমার? জীবনটা বাদ্যযন্ত্র নয়, বিশেষ করে আমার। যা গেছে তা কি করে ফির পাব। দেড় বছরের জেল খাটা আমাকে কে বিশ্বাস করবে? আজ হয়তো করতে চাইছে কিন্তু একদিন···

কেন এমন হল? কোন্ অপরাধে?

অপরাধ! না আমি কোন অপরাধ করিনি। তাহলে···

এখানেই আমার এলোমেলো হয়ে যায় সবকিছু। যন্ত্রণা বাড়ে। বুকের রক্তে দোলা জাগে। পথ—খুঁজি—একটু আলো বাতাস···

হয়তো আমার মত আরো অনেকেই পথ খুঁজছে—চাই আলো—বাতাস। পাচ্ছে কি? জানিনা।

অনেকদিন আগে বলা গায়ত্রী প্রসন্নের কিছু কথা আজও আমার বার বার মনে পড়ে। অবশ্য সেদিন তাঁর সব কথা যেমন বুঝিনি, বিশ্বাসও করতে পারিনি। আজও তাই। বিশ্বাসের থেকে বুঝতে পারিনা আমি। গোলমাল হয়ে যায়।

তিনি বলেছিলেন, জানিস রুদ্র, কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। নাগপুরে গ্রহণ করা হয়েছিল সমবায় কৃষির এবং ভুবনেশ্বরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের।

তর্কের খাতিরে পণ্ডিত নেহেরুকে যদি সমাজতন্ত্রবাদী বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও বলতে হয়; তিনি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভারতের মত অনগ্রসর দেশের দ্রুত অগ্রগতি একমাত্র সমাজতন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া ইতিহাসের গতিও সমাজতন্ত্রমুখী।

কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। বার বার প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তার কারণ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা দেশস্বাধীন হবার আগে থেকেই শক্তিশালী বণিক সম্প্রদায়ের কেনা গোলামে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁরা পণ্ডিত নেহেরুর জনপ্রিয়তা ভাঙিয়ে নিজেদের মতলব (একচেটিয়া কারবারীদের সমৃদ্ধি) করে গেছে নির্বিবাদে। এবং সেটা বুঝতে না পারার মত নির্বোধ পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন না। কিন্তু আপসের পথ ভিন্ন কিছু করার ছিলনা তাঁর।

সমাজতন্ত্র কোন ধর্মীয় তত্ত্বকথা নয়। একটা সামাজিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। একটা শক্ত করে গেড়ে বসা ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে সেই জায়গায় একটা নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন। পণ্ডিত নেহেরু সেটার made easy করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন।

দেখা গেল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অপূর্ব ভেল্কিবাজীতে পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈষয়িক উন্নতির পথে দেশ দুই এক পা এগুতে না এগুতেই কংগ্রেসের পৃষ্ঠ পোষক বড় বড় বণিকের বিষয় সম্পত্তি রাতারাতি ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠল এবং সেই কংগ্রেসী মন্ত্রী আর তাদের চামচেরাও রাতারাতি লাখপতি ক্রোর পতি হয়ে গেল (যেমন মোরারজী, পট্টনায়ক, বক্সী গোলাম মহম্মদ। এদের মধ্যে মোরারজী রণ ছোড়জী দেশাই একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ! তিনি ১৮৯৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ এক গ্রাম্য ইস্কুল মাষ্টারের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন)।

১৯১৭ সালে কলেজের পাঠ শেষ করে মোরারজী দেশাই স্নাতক হয়ে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করেন। সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় আন্দোলনে পটভূমি তৈরি হচ্ছে। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী জাতীয় মুক্তির গণ আন্দোলন সংগঠনে মহাত্মা গান্ধী তখন সবে মাত্র আবির্ভূত হচ্ছেন। জাতীয় কংগ্রেস তখন সাফল্যের শীর্ষ হয়ে চলেছে। সেদিন ভারতবর্ষে সন্ত স্নাতক এমন কোন তরুণ ছিল না যাকে কোন না কোন দিক থেকে জাতীয় আন্দোলনে আকৃষ্ট না করেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত তরুণ মাত্রেই সেদিন হয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় গণ আন্দোলনে অথবা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সামিল।

কিন্তু নিয়ম মাত্রেরই ব্যতিক্রম আছে। এমন দেশে, এমন যুগে সেদিন এমন শিক্ষিত তরুণও ছিল যে সযত্নে শুধু জাতীয় আন্দোলনের আঁচ বাঁচিয়ে

চলেছে তাই নয় পরন্তু ব্রিটিশ রাজ্যের দাসত্বের মধ্যেই নিজ জীবনের উন্নতির পথ খুঁজে পেয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারে চাকরি পেয়েছিলেন তরুণ মোরারজী দেশাই। প্রথমেই আমেদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর। এবং আনুগত্যের জন্য অল্পকালের মধ্যেই পদোন্নতি হয় এবং গোধরায় বদলি হয়ে যান।

ঠিক এই সময় গোধরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই দাঙ্গা সম্পর্কে বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করতে বলে। কিন্তু অসত্য রিপোর্ট পেশ করার জন্য তাঁর পদাবনতি ঘটে। প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি কালেক্টরের পদ থেকে নামিয়ে তাঁকে বোম্বাইয়ের গবর্ণরের এক নোটিশে তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটি কালেক্টর পদে অন্যত্র বদলী করা হয়। পদাবনতিতে ক্রুদ্ধ মোরারজী—সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সর্দার প্যাটেল তাঁকে গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তৃতীয় সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত করেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের সময় সর্দার প্যাটেলের সুপারিশেই ফের মন্ত্রীসভার রাজস্ব, কৃষি ও বন দপ্তরের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর তিনি আবার বোম্বাইয়ের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টে স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব মন্ত্রীর পদ অধিকার করেন। এই সময় তিনি শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলন দমনে এমন কুখ্যাতি অর্জন করেন যে বোম্বাইতে তাঁর পরিচিতি হয় 'পুলিশমন্ত্রী' নামে।

১৯৫২ সালে বালসার নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মোরারজী ডঃ আমুল দেশাইয়ের কাছে বিশ্রী ভাবে পরাজিত হন। অবশ্য নির্বাচনের আগে তিনি বলেছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে ছাড়বেন। অবশ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়েও তিনি মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। এবং তিনিই পৃথিবীর সর্ব প্রথম পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী যিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েও মুখ্যমন্ত্রীর পদ লাভ করেছিলেন।

মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠনের জন্যে আন্দোলনের সময়ে আন্দোলনকারী জনতাকে পথে দেখামাত্রই গুলি করা এবং গুলি করে হত্যাকরার হুকুম দেন। সেই সময়ে আন্দোলনে মহারাষ্ট্রে অসংখ্য আন্দোলনকারী নিহত হয় পুলিশের গুলিতে।

১৯৫৬ সালে মোরারজী দেশাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী থাকাকালে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সর্বনাশ করে একচেটিয়া শিল্পপতি ও বিদেশী পুঁজির সেবা করতে। ভারতবর্ষে টাকার অবমুল্যায়ন তাঁরই অন্যতম

কীর্তি। এর ফলে একদিন ভারতবর্ষ তার ১৭ কোটি টাকা মূল্যের সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা হারায়।

কিন্তু কি লাভ হয়েছে মোরারজী দেশাইয়ের? লাভ হয়েছে এই সামান্য মাইনের চাকুরে পুত্র কান্তিলাল হয়েছে বিপুল বিত্তের মালিক। এবং পুত্রের বিত্ত নিশ্চয়ই পিতারও।

আর আজ শ্রী দেশাই বার বার অনশন করছেন। তের মাস আগে একবার করেছিলেন, গুজরাটের বিধান সভা ভেঙ্গে দেবার জন্যে। দ্বিতীয় বার নির্বাচন ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবীতে। শ্রী দেশাইয়ের মত দেশ প্রেমিক নেতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল। ১৯৬৭ সালে যখন প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয় পশ্চিম বাংলায়, মন্ত্রী সভায় গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সরকার বাতিলের কথা বলেছিলেন যাঁরা শ্রী দেশাই তাঁদের একজন। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের পর একটানা ছয় বছরের জরুরী অবস্থা চালু রাখার তিনিও একজন সহযোগী।

এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বাতিলের প্রধান কারণ ছিল আইন শৃঙ্খলার অবনতি। দিনের বেলা মানুষ পথ চলতে ভয় পেত। জলসার হাঙ্গামায় মেয়েদের জামা কাপড়ের স্তূপ। সারা ভারতবর্ষ জেনেছিল পশ্চিমবঙ্গ এক ভয়ঙ্কর জায়গায় পরিণত হয়েছে।

অবশ্য আইন শৃঙ্খলার অবনতি যে হয়েছিল তা মিথ্যা নয়। এবং তার জের আজও চলছে। সেদিন আকাশবাণী, সংবাদপত্র এবং নেতার দল ছিলেন সোচ্চার।

কিন্তু ভারত সরকারের প্রকাশনায় 'ক্রাইম ইন ইণ্ডিয়া' বলছে ভিন্ন কথা। ১৯৬৪ থেকে ৬৯ এর দেশের প্রধান প্রধান শহরে খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, অপহরণে শীর্ষস্থান দখল করে আছে বোম্বাই। তারপরই দিল্লী।

আর ১৯৬৯ সালে খুনের সংখ্যা ১৬৮, দিল্লীতে ৭৫, কলকাতায় ৬৮।

অপহরণে—বোম্বাই ১৭০, দিল্লী ২৭০, কলকাতায় ১৩৯।

ডাকাতি—বোম্বাই ২৯, দিল্লী ১, কলকাতা ১৪।

ছিনতাই—বোম্বাই ২০৬, দিল্লী ৩৩, কলকাতা ৩২।

১৯৬৪-৬৯ সালের মধ্যে দেশের চারটি সহরে অপরাধ মুলক ঘটনার হিসাব :—

	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯
বোম্বাই—	২১৫৬৩	২৬৭৯১	২৮০৮৫	২৮৮৯১	২৭৫৬৯	২৫২৮৯

দিল্লী—	১৪৯৮১	১৬২১৬	১৫৯৮১	১৬৩৫৮	১৫৭৬৩	১৬২৫৪
কলকাতা—	২৩৫৯৮	২১০৩০	২০৭৫৯	১৩১৮৫	১১৮৬৪	১০৫০১
মাদ্রাজ—	৭৪৭০	৭০১০	১০৬৫৯	১১৭৪৮	১১২৯৭	১১৭০৭

দিল্লীতে প্রতি ২৫০ জনের জন্য একজন করে পুলিশ আছে। কলকাতায় ৯০০ জনে একজন। ভারতবর্ষে জন্ম হারের চেয়ে অপরাধের হার অনেক বেশি। ষাটের দশকে জন্মহার ছিল শতকরা ২৭·৪, অপরাধের হার ৫৭·৬। এখন দেশে প্রতি ৩০ মিনিটে একটি করে খুন হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় দুটি রাহাজানি এবং সাতটি সংঘর্ষ।

আর ঋণভারে জর্জরিত দেশের মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে উঠল জীবন যন্ত্রণা।

শিল্প লাইসেন্স প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত হয় ১৯৫১ সালে। লাইসেন্স প্রথার আসল লক্ষ্য ছিল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলা। কোন শিল্পের ওপর যাতে কারও একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেদিকে নজর রাখা এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন শিল্প ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ সরকারী দপ্তরখানা এবং মন্ত্রীসভার নিজেদের লোকেদের দৌলতে প্রায় সব রকম শিল্পের লাইসেন্স আগে ভাগে নিয়ে বসে আছে। কালোটাকার খেলায় অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

এক সময় ডালমিয়া সাহেব বিভিন্ন কোম্পানীর নামে বাজার থেকে (শেয়ার বেচে) কোটি কোটি টাকার মূলধন সংগ্রহ করেন কিন্তু সেই কোম্পানিগুলো কাজ সুরু করতে না করতে পরিচালকদের প্রচেষ্টায় লিকুইডেশনে চলে যায়। তাতে লগ্নী কারকরা পথে বসেছেন বটে কিন্তু ডালমিয়ার ব্যক্তিগত তহবিল রাতারাতি কুবেরের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে।

বিড়লা সাহেবও মোটরের কারখানা খোলার জন্যে শেয়ার বেচে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। বছরের পর বছর সেই কারখানায় কোন মোটর তৈরি হয়নি। একদিন বাজারে শেয়ারের দাম পড়ে গেছে। বিড়লারা তখন দশটাকার শেয়ার পাঁচটাকায় কিনে একই শেয়ারের ওপর ডবল মুনাফা তুলেছেন। তারপরই ডিভিডেণ্ট ঘোষণা করে সেই লাভটাকে আরো ফাঁপিয়ে ফেললেন। বানিয়া বুদ্ধি টাকায় টাকা বাড়িয়েছে।

বিড়লা পরিবারই ভারতের বৃহত্তম শিল্প বাণিজ্য সংস্থার মালিক। শিল্প বাণিজ্য পতিদের তালিকায় প্রথম স্থান থেকে টাটাদের হটিয়ে বিড়ালারা সেই স্থানটি দখল করেছেন।

বিড়লাদের উত্থান ইংরেজ আমলে। তারা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমভাবে সদ্ভাব বজায় রেখে নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার তাঁদের কারবারের সমৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের কয়েকজন নেতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরা। সেই সব স্বদেশী নেতার কাজ ছিল বিড়লাদের স্বদেশী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক বলে জোর গলায় প্রচার করা। অবশ্যই ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় ছিল তাঁদের।

ইংরেজ চলে যাবার পর কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে পুরানো হৃদ্যতার সূত্র ধরে বিড়লারা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। বিড়লারা সমগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের হটিয়ে কি করে বড় বড় লাইসেন্স বাগিয়ে নিয়েছে, সে কাহিনী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ফাঁস হয়েছিল। এক সময় কংগ্রেস দলের চন্দ্রশেখর বিড়লাদের অসংখ্য অবৈধ এবং নীতি বহির্গত ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ তুলেছিলেন লোক সভায়। উঠেছিল তদন্তের দাবি। কিন্তু মোরারজী দেশাই তা অগ্রাহ্য করেছিলেন। অবশ্য পরে লাইসেন্স কেলেঙ্কারী তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ পত্রটি পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। কমিটি সেটা বিবেচনা করে তদন্তের অনুকূলেই রায় দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের আয়কর কমিশনার লক্ষাধিক টাকা আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে তালিকা প্রকাশ করেছেন (১৯৬৯), তাতে কলকাতায় বিড়লা পরিবারের মোট ষোল জন বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা আয়ের ওপর কর দিয়ে থাকেন। কলকাতার লক্ষাধিক টাকা আয় বিশিষ্ট (তার চেয়ে কম আয়ের বিড়লাদের তালিকা আয় কর কমিশনার প্রকাশ করেননি। কাজেই তাদের সংখ্যা এবং আয়ের পরিমাণ জানা সম্ভব নয়) ষোলজন বিড়লার মোট বার্ষিক নীট আয় ৩৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। বিড়লাদের বিষয় সম্পদের তুলনায় আয়টা অল্প বলেই মনে হয়।

১। বি. কে. এ. ভি. বিড়লা—৪ লক্ষ ৯৫ হাজার

২। বি. এম. বিড়লা—৪ লক্ষ ৭৫ হাজার

৩। চন্দ্রকান্ত বিড়লা—১ লক্ষ ৮ হাজার

৪। নির্মলা দেবী বিড়লা—৩ লক্ষ ৩৮ হাজার

৫। জি. পি. বিড়লা—২ লক্ষ ৬৩ হাজার

৬। জি. ডি. বিড়লা ৩ লক্ষ ৯ হাজার

৭। জে. কে বিড়লা—১ লক্ষ ৪২ হাজার
৮। এল. এন. বিড়লা—২ লক্ষ ৩৭ হাজার
৯। এস. পি. বিড়লা—৪ লক্ষ ২৪ হাজার
১০। নির্মলা দেবী বিড়লা—১ লক্ষ ৩৪ হাজার
১১। রুক্মিনী দেবী বিড়লা—২ লক্ষ ৭১ হাজার
১২। সরলা দেবী বিড়লা—১ লক্ষ ৩৫ হাজার
১৩। এম. কে. বিড়লা—১ লক্ষ ৫ হাজার
১৪। এস. কে. বিড়লা—১ লক্ষ ৪৭ হাজার
১৫। সুশীলা দেবী বিড়লা—১ লক্ষ ৫৬ হাজার
১৬। সুনন্দা দেবী বিড়লা—১ লক্ষ ৫৮ হাজার

মোট ৩৮ লক্ষ ৬৩ হাজার

মনোপলি এনকোয়ারি কমিশন তাঁদের রিপোর্টে ১৯৬৩-৬৪ সালে ৭৫টি প্রধান ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সম্পত্তির অবস্থা সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পেশ করেছিলেন।

কোম্পানী ল'কমিটি বা সাধারণ পরিচিত অনুসারে ভাবা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোম্পানী অ্যাক্টের ৩৭০ ও ৩৭২ ধারায় বলা হয়েছে একটা সংযুক্ত সংস্থা যদি বিনিয়োগকারী কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট হয় কিংবা উভয়েই যদি একই কোম্পানীর অধীন হয় তাহলে সেই সংস্থাকে বিনিয়োগকারী কোম্পানীর সমগোষ্ঠীভুক্ত বলে ধরা হবে। ডঃ হাজারি তাঁরা 'দ্য স্ট্রাকচার অবভ প্রাইভেট কর্পোরেট সেক্টর' গ্রন্থে ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতখানি কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার পরিমাপ করার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সংক্রান্ত ধারণার সংজ্ঞা নিরুপণের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মত কিন্তু একেবারে বিপরীত। তাঁদের মতে সংযুক্ত সংস্থা এমন সব সংস্থা নিয়ে গঠিত যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে এক অভিন্ন কর্তৃত্বের হাতে। তাঁদের মতে গোষ্ঠীটি সব সময়ে একটা আবদ্ধ চক্র নয়, একত্র গ্রথিত অনেকগুলি চক্রের সঙ্গে বরং তার তুলনা করা যেতে পারে।

এরই ভিত্তিতে বলেছেন যে, ১৯৫১তে টাটা গোষ্ঠী গঠিত ছিল ১০২টি কোম্পানী নিয়ে, ১৯৫৮তে ১২০টি। তাঁর মতে বিড়লা গোষ্ঠীর আওতায় রয়েছে কানোড়িয়া, খিরনি, কোঠারি, মন্ত্রী, শভাতিয়া, কাজরিওয়াল প্রভৃতিরা।

এইভাবে দেখিয়েছেন এই গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৫১ সালে ছিল ২৫৩টি কোম্পানী, ১৯৫৮তে ২৯৮টি। ডঃ হাজারির মতে, মফতলাল গোষ্ঠী ছিল ১৯৫১ তে ২৯টি কোম্পানী নিয়ে, ১৯৫৮তে ৩৮টি। কিন্তু মনোপলি ইনকোয়্যারি কমিশনের বিচার অনুযায়ী এই সংখ্যাগুলি হ্রাস পেল। ১৯৬৪ সালে আলোচ্য গোষ্ঠীগুলোর কোম্পানীর সংখ্যা তদনুযায়ী দাঁড়াল : টাটা—৫৩ ; বিড়লা—১৫১ ; মফতলাল—২১।

মনোপলি ইনকোয়্যারি কমিশন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এই বলে যে, তাতে এমন সব সংস্থা থাকে যা এই গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী স্বার্থ—'গোষ্ঠী প্রভু'র চূড়ান্ত ও নীতি নির্ধারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার অধীন। তদনুযায়ী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোকে, যথা কোঠারি, হিম্মত সিংকা, কার্জারিওয়াল, সোমানি ইত্যাদি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কম্পানিগুলোকে কমিশন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অধীনে ফেলেছেন, যা প্রধান গোষ্ঠীটি, বিড়লা গোষ্ঠী থেকে স্পষ্টতই পৃথক। কমিশনের নীতি অনুসরণ করে দেখা যায় টাটা গোষ্ঠীর মধ্যে কার্যরত কোম্পানীগুলোর মোট সংখ্যা ১৯৬৭ সালে ছিল ৫৩, তাদের সম্পত্তি ছিল ৫৫১ কোটি টাকার। বিড়লা গোষ্ঠীতে, যে ১৭৯টি কোম্পানীর ১৯৬৭ সালে সম্পত্তি ছিল প্রায় ৫১০ কোটি টাকা। মফৎলাল গোষ্ঠীতে ১৯৬৭ সালে ছিল ২৩টি কোম্পানী, সম্পত্তির পরিমাণ ১২৭ কোটি টাকা।

টাটা গোষ্ঠী : মনোপলি ইনকোয়্যারি কমিশন ৫৩টি কোম্পানীকে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরেছেন। ১৯৬৪ সালের পর তিনটি কোম্পানী—বেটমান কুফার লিঃ, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড ডোমেষ্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেজ কম্পানি লিঃ এবং মাইসোর ক্রোমাইট লিঃ লিকুইডেশনে যায়। ইনভেষ্টা মেশিন টুলস অ্যাণ্ড ইনজিনিয়ারিং কোম্পানী লিঃ টাটা ইনজিনিয়ারিং অ্যাণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী লিঃ'র অঙ্গীভূত হয়। চারটি কোম্পানী হারাবার পাশাপাশি অন্য চারটি কোম্পানী টাটা গোষ্ঠীর হাতে আসে।

১। টাটা মালিন অ্যাণ্ড জেরিন কোং লিঃ।

২। আসভাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ।

৩। টাটা এস, অ্যাণ্ড এল সেলস লিঃ।

৪। স্কটিশ ইণ্ডিয়া মেশিন টুলস লিঃ।

বিড়লা গোষ্ঠী :—মনোপলি ইনকোয়্যারি কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার পর, রিপোর্ট বর্ণিত ১৫১টি কোম্পানীর মধ্যে দুটি কোম্পানী এই গোষ্ঠীরই অন্যান্য

কোম্পানীগুলির অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং একটি কোম্পানী—ওরিয়েন্ট জুট প্রেস কোং লিঃ, যার রেজিষ্টার্ড অফিস ছিল পাকিস্থানে—পাকিস্থান সরকার ১৯৬৫ সালে নিয়ে নেয়। ১৯৬৭-তে বিড়লা গোষ্ঠীতে ছিল ১৪৭টি কোম্পানী। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ১২টি। এগুলি হয় আলোচ্য সময়ের মধ্যে বিড়লা গোষ্ঠী নিয়েছে, না হয় নতুন উদ্যোগ।

১। আসাম ফ্রুট প্রোডাক্টস লিঃ।

২। সেঞ্চুরি এনকা লিঃ।

৩। ইণ্ডিয়ান রেয়ন কর্পোরেশন লিঃ।

৪। অ্যাটলাস আয়রণ অ্যাণ্ড অ্যালয়জ লিঃ।

৫। বিহার অ্যালয়জ ষ্টীল লিঃ।

৬। হিন্দুস্থান হেভি কেমিক্যালস লিঃ।

৭। মাইসোর সিমেন্ট লিঃ।

৮। জয়শ্রী একসপোর্ট লিঃ।

৯। নুন কর্পোরেশন লিঃ।

১০। অটোমোটার্স লিঃ।

১১। নারোনেল এডোয়ার্ডস লিঃ।

১২। ইণ্ডিয়া ষ্টীল শিপ কোং লিঃ।

এই ১২টি কোম্পানী ছাড়াও আরো কয়েকটি কোম্পানী আছে যাদের ব্যালান্স শীট পাওয়া যায় নি।

মফতলাল গোষ্ঠী :—১৯৬৪ সালে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ২১টি কোম্পানী। তারপর নবীন ফ্লুওরিন কেমিক্যাল লিঃ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গত তিন বছরে নতুন দুটি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ভার হাতে পেয়েছে। একটা নতুন কোম্পানী চালু করেছে।

১। আমেদাবাদ জুপিটার স্পিনিং উইভিং অ্যাণ্ড ম্যানুফাকচারিং কোং লিঃ।

২। ওরিয়েণ্ট ডাইজ অ্যাণ্ড কেমিক্যালস লিঃ।

৩। পালিও লেকিনস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (নতুন কোম্পানী)

টাটা গোষ্ঠী : ১৯৬৬-৬৭তে আর্থিক অবস্থা।

মনোপলি ইনকোয়ারি কমিশন, ১৯৬৩-৬৪তে টাটা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ৫৩টি কোম্পানীর মোট সম্পত্তির হিসাব করেছেন ৪১৭.৭ কোটি টাকা। কিন্তু

এই কোম্পানীগুলির ১৯৬৩-৬৪ সালের বার্ষিক হিসাব সতর্কভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে টাটার সম্পত্তি সে বছর ছিল ৪১৮·১ কোটি টাকা। এই ০·৪ কোটি টাকার তফাতের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তিনটি কোম্পানী থেকে :

(লক্ষ টাকার হিসাব)

		কমিশনের দেখানো অঙ্ক	ব্যালান্স শীট ১৯৬৪-র হিসাবে	তফাৎ
১।	সেন্‌ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং উইভিং অ্যাণ্ড ম্যান্থঃ কোং লিঃ	৬,২৫	৬,৭৩	+৪৮
২।	টাটা কেমিঃ লিঃ	১০,১৫	১০,১১	— ৪
৩।	ফরবেস ফরবেস ক্যাম্পবেল এ্যাণ্ড কোং লিঃ	১,২১	১,১৩	— ৮
				+ ৩৬

মনে হয় ১৯৬৩-৬৪র বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব কমিশন তখনও পাননি, যে জন্যে আগের বছরের ব্যালান্স শীট থেকে সম্ভবত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। চারটি কোম্পানী লিকুইডিশন ও অন্তর্ভুক্তির জন্য বাদ ছেড়ে দিয়ে, টাটার সম্পত্তি ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭র মধ্যে বেড়েছে ১৩২·৫ কোটি টাকা। যেমন :—

টাটা গোষ্ঠীর সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা

কোটি টাকার অঙ্কে

বিষয়	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৬-৬৭	বৃদ্ধির শতকরা হিসাব
কোম্পানীর সংখ্যা	৫৩	৫৩	×
আদায়ীকৃত মূলধন	১০২·৩	১২৭·৩	২৪·৪
সংরক্ষিত তহবিল	৯৫·৫	১০৬·৯	১১·৯
মোট মূল্য	১৯৭·৮	২৩৪·২	১৮·৩
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	৭৮·৫	১০৫·০	৩৩·৭
স্বল্প মেয়াদী ঋণ	৫০·২	৮৯·৬	৭৮·৬
অন্যান্য দায়দায়িত্ব ইত্যাদি	৯১·৫	১২১·৮	৩৩·১
মোট সম্পত্তি (প্রদর্শিত)	৪১৮·১	৫৫০·৬	৩১·৭
স্থায়ী সম্পত্তি	২০২·৯	২৫২·৭	২৪·৫
বিনিয়োগ	৪৩·০	৫১·০	১৮·৮
ঋণদান ও অগ্রিম	১৯·৩	৪২·৮	১২২·০
টার্ন ওভার (প্রধান আয়)	৩২৫·০	৪৪৩.৬	৩৬·৫
ট্যাক্সের আগে মুনাফা	৩৭·০	৪৪·০	১৮·৮
ট্যাক্সের পরে মুনাফা	২৪·৯	২১·০	— ১৫·৯

টাটার প্রদর্শিত মোট সম্পত্তি ১৯৬৬-৬৭ সালে যে তিন বছর কাল সমাপ্ত হয় তার মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ, কিন্তু সেই একই সময়ে স্থায়ী সম্পত্তির বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম—২৪'৫ শতাংশ। বাকি সম্পত্তিগুলো হল অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ারে ও অগ্রিম ঋণদানে ব্যবহৃত অর্থ। এবং আর্থিক অবস্থার যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে তাহলে গোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত কোম্পানীগুলোর ট্যাক্স দেওয়ার পর মুনাফার নেতিবাচক বৃদ্ধি হার। আলোচ্য তিন বছর কালে, ট্যাক্সের আগে মোট মুনাফার প্রায় ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা যায়, কিন্তু ট্যাক্সের পর মুনাফার পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪-র স্তর অপেক্ষা ১৯৬৬-৬৭তে ১৬ শতাংশ কমে এসে দাঁড়ায়।

গোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত কোম্পানীগুলোর ১৯৬৬-৬৭ সালের পুঁজির কাঠামোতে ঋণ গ্রহণ ও মোট মূল্য ছাড়া ১৯৬৩-৬৪র কাঠামো থেকে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। যেমন :—

	বিষয়	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৬-৬৭
১।	মোট সম্পত্তির অনুপাতে আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা হিসাব	১৪'৫	২৩'১
২।	মোট সম্পত্তির অনুপাতে মোট মূল্যের শতকরা হিসাব	৫৭'৩	৪২'৫
৩।	সামগ্রিক সম্পত্তির অনুপাতে মোট ঋণের শতকরা হিসাব	৩০'৮	৩৫'৩
৪।	মোট সম্পত্তির অনুপাতে অন্যান্য দায় দায়িত্বের শতকরা হিসাব	১১'৯	২২'১
৫।	মোট সম্পত্তির অনুপাতে স্থায়ী সম্পত্তির শতকরা হিসাব	৪৮'৫	৪৫'৯

১৯৬৩-৬৪ সালে টাটার অন্তর্ভূক্ত কোম্পানীগুলোর আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ১০২'৩ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ নাগাদ বেড়ে দাঁড়ালো ১২৭'৩ কোটি টাকায়, অর্থাৎ বৃদ্ধি ঘটল ২৫ কোটি টাকার। এই বৃদ্ধির ২ কোটি টাকা এসেছে বাড়তি চারটি কোম্পানীর অন্তর্ভুক্তির ফলে। বাকি ২৩ কোটি টাকা বেড়েছে পুরানো কোম্পানীগুলোর।

আলোচ্য তিন বছরে আদায়ীকৃত মূলধনে ২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি কোন

উৎস থেকে এল তা কৌতূহলজনক। গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীগুলোর বার্ষিক হিসাব থেকে আহৃত তথ্য অনুযায়ী আদায়ীকৃত মূলধনে প্রায় ১৫ কোটি টাকা যোগ করা হয়েছে সংরক্ষিত তহবিলকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে। আলোচ্য সময়ে গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত মাত্র তিনটি কোম্পানী ২·৭ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার ছেড়ে ছিল।

গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীগুলো তাদের সঞ্চয় বাড়িয়েছে ১৯৬৩-৬৪ র ৯৬ কোটি টাকা থেকে ১৯৬৬-৬৭তে প্রায় ১০৭ কোটি টাকায়। প্রায় ১৫ কোটি টাকাকে পুঁজিতে পরিণত করে আদায়কৃত মূলধনের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীগুলোর বার্ষিক হিসাবে প্রদর্শিত সঞ্চয়ের অবস্থার মধ্যে পুঁজিতে পরিণত করার অঙ্কগুলো নেই। মোটামুটিভাবে চারটি কোম্পনীর ক্ষেত্রে যে অঙ্কগুলো :—

কোম্পানী	(কোটি টাকায়) যে সঞ্চয়কে মূলধনে পরিণত করা হয়েছে
টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কো° লি:	১১·০
ভোলটাজ	০·৭
টেলকো	২·১
টাটা অয়েল মিলস	০·৪
মোট	১৪·২

টাটা গোষ্ঠি ঋণ করা তহবিলের ওপর তার নির্ভরশীলতা যথেষ্ট বাড়িয়েছে। স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের যে পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ১২৯ কোটি টাকা ১৯৬৬-৬৭তে তা বেড়ে হয়েছে ১৯৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ তিন বছরে বেড়েছে ৬৬ কোটি টাকা।

১৯৬৬-৬৭ সালে বকেয়া ঋণের বেশ বড় একটা অংশ গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীগুলো আদায় করেছে ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনষ্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, ওয়াশিংটন থেকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি ফর ইণ্টার-ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট থেকে। ১৯৬৬-৬৭ সালে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে দুটি জায়গা থেকে।

উৎস	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৬-৬৭	(কোটি টাকায়) ১৯৬৩-৬৪ থেকে নীট বৃদ্ধি
১। অর্থ মঞ্জুরী প্রতিষ্ঠান			
(ক) ইণ্ডিয়ান ফিনান্স কর্পোরেশন	—	১'১	১'১
(খ) এন, আই, ডি. সি,	০'৫	০'৭	০'২
(গ) ইনভেস্টমেণ্ট কর্পো. অব ইণ্ডিয়া	০'০১	০'১	০'১
(ঘ) আই. সি, আই. সি, আই	১'০	২'৪	১'৪
২। কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার সমূহ	১১'২	৬'২	(-) ৫'০
৩। বৈদেশিক ঋণ			
(ক) আই, বি. আর, ডি	৪১'৬	৪২.৮	১'৪
(খ) ইউ, এস, এ, আই, ডি	৯'৭	২৩'৮	১৪'১
৪। দীর্ঘ মেয়াদী পরিশোধ মূলক ঋণ	০'৩	৩'০	২'৭
৫। অন্যান্য ঋণ. অর্থাৎ ব্যাঙ্ক. ম্যানেজিং এজেন্টস. সাবসিডিয়ারি ও হোল্ডিং কোম্পানী সমূহ. বানিজ্য ও অন্যান্য জমা ইত্যাদি (স্বল্প মেয়াদী ঋণ)	৫০'২	৯০'২	৪০'০০
৬। ডিবেন চার	১৪'৪	২৪'৩	৯'৯
মোট	১২৮'৭	১৯৪'৬	৬৫'৯

১৯৬৬-৬৭তে ট্যাক্সের আগে মুনাফা ছিল প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ; ১৯৬৩-৬৪-র স্তর থেকে এই বৃদ্ধি ছিল প্রায় ৭ কোটি টাকার মত। কিন্তু ট্যাক্স বাদ দেবার পর গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১৯৬৬-৬৭তে মাত্র ২১ কোটি টাকা. যেখানে ১৯৬৩-৬৪তে ছিল প্রায় ২৫ কোটি টাকা। আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা হিসাবে ট্যাক্সের পর মুনাফা ছিল ১৯৬৩-৬৪র ২৪'৪-এর তুলনায় ১৯৬৬তে ১৬'৫। যদিও গোষ্ঠীভুক্ত পাঁচটি কোম্পানী দেখিয়েছে যে তারা ১৯৬৬-৬৭তে মোট প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা লোকসান খেয়েছে, তবুও গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর 'টার্নওভারের' ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠীটির সামগ্রিক লাভের অবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায় না। বিক্রয় বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ ১৯৬৬-৬৭তে ৪৪৩'৬ কোটি টাকা। আর এটা ছিল ১৯৬৩-৬৪ স্তর অপেক্ষা ৩৭ শতাংশ উর্দ্ধে। এবং ট্যাক্স বাবদ বাদ দেবার পর ১৯৬৩

৬৪র তুলনায় ১৯৬৬-৬৭তে লাভ কম হবার কারণ হিসাবে হয়তো এই জিনিসটিকে ধরা যায় যে অন্য দুটি গোষ্ঠীর চেয়ে এই গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর ট্যাক্সের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যবস্থা রেখেছে। মোট হিসাবে ট্যাক্স বাবদ ধরা হয়েছে ট্যাক্সের আগের লাভের প্রায় ৫৫ শতাংশ।

মোট অর্জিত 'গ্রস প্রফিট' থেকে গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলি প্রায় ১·৫ কোটি টাকা দিয়েছে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বেতন হিসাবে, এর মধ্যে আছে ম্যানেজিং এজেন্সি কমিশন প্রভৃতি। এছাড়াও সোল সেলিং এজেন্টদের মারফত ১৯৬৬-৬৭ সালে যে বিক্রয় হয়েছে তার কমিশন বাবদ কোম্পানীগুলো দিয়েছে ০·৫কোটি টাকা।

১৯৬৩-৬৪তে টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সম্পত্তির মধ্য থেকে ৯০ শতাংশের বেশী লগ্নী করা হয়েছে ন-টি শিল্পে যদিও এই গোষ্ঠীর বিনিয়োগ সর্বমোট ২১টি শিল্পে বিস্তৃত। কিন্তু এই গোষ্ঠীর বিনিয়োগের প্রধান অংশ ন-টি অগ্রাধিকার মূলক শিল্পেই উচ্চতর স্তরে সীমাবদ্ধ রয়েছে। 'রেলওয়ে ও মোটর গাড়ি', 'লৌহ ও ইস্পাত' এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন এই তিনটি শিল্পেই ১৯৬৬-৬৭ সালে এই গোষ্ঠীর বিনিয়োগের ৬১ শতাংশের বেশি পেয়েছে, ১৯৬৩-৬৪তে এটা ছিল ৬৫ শতাংশ। সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে অবশ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালে বেশি বিনিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে 'রেলওয়ে অটো মোবাইলই' বেশি বিনিয়োগের জন্যে মোট সম্পত্তির বৃহত্তর ভাগকে আকর্ষণ করেছে। যেমন—

শিল্প অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টনের অবস্থা, সম্পত্তির নীট বৃদ্ধি

(১) ১৯৬৩-৬৪

শিল্পের নাম	কোম্পানীর সংখ্যা	মোট সম্পত্তি	প্রতি শিল্পে মোট সম্পত্তির শতকরা বিনিয়োগের হার
১। রেলওয়ে ও অটোমোবাইল	২	৫৮৭৬·২	১৪·০
২। লৌহ ও ইস্পাত	৩	১৬০৫২·০	৩৮·৫
৩। রাসায়নিক ও সহযোগী পণ্য	৫	২১৯৩·৮	৫·২
৪। বীমা ব্যবসায়	৩	২৬১৬·১	৬·২
৫। বাণিজ্য ও সম্পত্তির ব্যবসা	৮	২৩৭৮·৫	৫·৭

৬।	সূতি বস্ত্রশিল্প	৫	২৩৪৫·৯	৫·৬
৭।	বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩	৫০৭৬·২	১২·১
৮।	টিউব শিল্প (ধাতব)	১	১৫৯৭·৪	৩·৮
৯।	রেডিও তৎ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং মেসিন টুলস নির্মান শিল্প	৩	৩৬৮·৯	০·৯
১০।	চা বাগিচা	১	১১১·৪	০·৩
১১।	সিমেণ্ট ও রিফ্র্যাক্টরি	২	৫৮৬·২	১·৪
১২।	ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবসা	৫	৯৬৭·২	২·৩
১৩।	লগ্নীর ব্যবসা	৪	১১৪৭·৮	২·৭
১৪।	প্রকাশনা	১	৪০·১	০·১
১৫।	তামাক শিল্প	১	৭২·৬	০·২
১৬।	হোটেল ব্যবসা	১	৮২·০	০·২
১৭।	বনস্পতি তেল	১	৬৯·৭	০·২
১৮।	মৎস্য শিল্প	১	২৪·৪	০·১
১৯।	সেফডিপোজিট ব্যবসা	১	৩·৩	—
২০।	কয়লা খনি	১	১৯৬ ০	০·৫
২১।	ম্যান্গানিজ মাইনিং	১	২·৩	—
	মোট	৫৩	৪১৮০৮·০	১০০·০

লক্ষ টাকার হিসাব

(২)

	কোম্পানী সংখ্যা	মোট সম্পত্তি	১৯৬৬—৬৭ প্রতি শিল্পে মোট সম্পত্তির শতকরা বিনিয়োগের হার	নীটবৃদ্ধি	সম্পত্তির প্রতি শিল্পে মোট বৃদ্ধিতে শতকরা সম্পত্তি বৃদ্ধি
১। ,,	২	৯৪৪৩·৫	১৭·২	৩৫৬৭·৩	২৬·৯
২। ,,	৩	১৮২২৩·৮	৩৩·১	২১৭১·৮	১৬·৪
৩। ,,	৫	৩৭১৬·৮	৬·৮	১৫২৩·০	১১·৫

৪ । ,,	৩	৩৭৮৮·৪	৬·৯	১১৭২·৩	৮·৮
৫ । ,,	৮	৩৪২৩·৬	৬·২	১০৪৫·১	৭·৯
৬ । ,,	৫	৩৩৬৩·৯	৬·১	১০১৮·০	৭·৭
৭ । ,,	৩	৫৯৮৬·০	১০·৯	৯০৯·৮	৬·৯
৮ । ,,	১	২৫০২·৮	৪·৫	৯০৫·৪	৬·৮
৯ । ,,	৪	৭৮৯·৭	১·৪	৪২০·৮	৩·২
১০ । ,,	১	২১২·০	০·৪	১০৯·৬	০·৮
১১ । ,,	২	৬৭৮·৯	১·২	৯২·৭	০·৭
১২ । ,,	৫	১০৫৭·২	১·৯	৯০·০	০·৭
১৩ । ,,	৪	১২০৯·৩	২·২	৬১·৫	০·৫
১৪ । ,,	১	৮৯·৩	০·২	৪৯·২	০·৪
১৫ । ,,	১	১২০·৪	০·২	৪৭·৮	০·৩
১৬ । ,,	১	১২৫·৭	০·২	৪৩·৭	০·৩
১৭ । ,,	১	৯১·০	০·২	২১·৬	০·২
১৮ । ,,	১	২৮·৬	০·১	৪·২	—
১৯ । ,,	১	৫·৬	—	২·৩	—
২০ । ,,	১	১৯৩·৫	০·৩	(-) ২·৫	—
২১ । ,,	—	—	—	(-) ২·৫	—
মোট	৫৩	৫৫০৫৯·৩	১০০·০	১৩২৫১·৩	১০০·০০

মনোপলি ইনকোয়্যারি কমিশনের রিপোর্টে বিড়লা গোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা :—

কোটি টাকার হিসাবে

	১৯৬৩—৬৪
কোম্পানীর সংখ্যা	১৫১
আদায়ীকৃত মূলধন	৭৬·৪
সম্পত্তি	২৯২·৭
টার্ণওভার	২৯০·২

১৫১টি কোম্পনীর ব্যালান্স শীট ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এদের আদায়ীকৃত মূলধন ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ৭৬·৪ কোটি টাকা আর সম্পত্তির

মোট মূল্য ২৯৩·২ কোটি টাকা। এই দুটি অঙ্কের পার্থক্যের কারণ কমিশনের তথ্য সংগ্রহের সময় কয়েকটি কোম্পানীর ১৯৬৩-৬৪ সালের ব্যালান্স শীট পাওয়া যায়নি।

১৯৬৬-৬৭ সালে বিড়লা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীর সংখ্যা হয়েছে ১৫৯। অবশ্য এর মধ্যে নতুন কয়েকটি সংস্থা নেই, যেমন বিড়লা সারভিসেস লিঃ, জুয়ারি অ্যাগ্রো কেমিক্যালস, গোয়ার একটা নতুন সার কারখানা।

১৯৬৬-৬৭ সালে সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা :—

কোটি টাকার অঙ্কে

বিষয়	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে বৃদ্ধির শতকরা হিসাব
কোম্পানীর সংখ্যা	১৫১	১৫৯	৫·৩
আদায়ীকৃত মূলধন	৭৬·৫	১০৪·৬	৩৬·৯
সংরক্ষিত তহবিল	৭৭·৭	১০৯·৫	৪০·৯
ঋণ-স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী	৮৭·১	১৯০·৭	১১৯·০
অন্যান্য দায়দায়িত্ব ইত্যাদি	৫২·০	১০৩·৮	১০০·০
মোট সম্পত্তি	২৯৩·২	৫০৯·৮	৭৩·৮
স্থায়ী সম্পত্তি	১৩৬·৯	২৪৬·৩	৭৯·৯
টার্ণওভার	২৯০·২	৪৫৫·০	৫৬·৮
ট্যাক্সের আগে মুনাফা	২৭·৬	৪২·৮	৫৫·৫
ট্যাক্সের পরে মুনাফা	১৬·৮	২৯·৯	৭৮·০

লক্ষণীয় যে, সামগ্রিক ভাবে গোষ্ঠীটির মোট সম্পত্তি ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭ মধ্যে বেড়েছে ৭৩·৮ শতাংশ, আর আদায়ীকৃত মূলধন বেড়েছে ৩৭ শতাংশ এবং সংরক্ষিত তহবিল প্রায় ৪১ শতাংশ। ঋণের ও নির্ভরশীলতা বেড়েছে— ১১৯ শতাংশ। ডিপ্রিসিয়েশন, সোল সেলিং এজেন্সী কমিশন বাদ দিয়ে ট্যাক্সের আগে মুনাফা এই সময় বেড়েছে ৫৫·৫ শতাংশ। কিন্তু মোট নিয়োজিত পুঁজির দিক থেকে এই মুনাফা ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ৯·৪ শতাংশ, ১৯৬৬-৬৭তে কিছুটা কমে হয়েছে ৮·৩ শতাংশ।

এই গোষ্ঠীর পুঁজির কাঠামোতে রদবদল :—

বিষয়	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৬-৬৭
মোট সম্পত্তির অনুপাতে আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা হিঃ	২৬·১	২০·৬
মোট সম্পত্তির অনুপাতে নীট মূল্যের শতকরা হিঃ	৫২·৬	৪২·১
মোট সম্পত্তির অনুপাতে ঋণের শতকরা হিঃ	২৯·৭	৩৭·৫
মোট সম্পত্তির অনুপাতে অন্যান্য দায় দায়িত্বের শতকরা হিঃ	১৭·৭	২০·৪
মোট সম্পত্তির অনুপাতে স্থায়ী সম্পত্তির শতকরা হিঃ	৪৬·৭	৪৮·৪

১২টি নতুন কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা

লক্ষ টাকায়

কোম্পানীর নাম	আদায়ীকৃত মূলধন	মোট সম্পত্তি
১। আসাম ফ্রুট প্রোডাক্টস	০·০৭	০·০৭
২। সেঞ্চুরি এনকা লিঃ	০·০১	০·০১
৩। ইণ্ডিয়ান রেয়ন কর্পোঃ লিঃ	৩৩৩·৬০	৭৪৭·৯৪
৪। অ্যাটলাস আয়রণ অ্যাণ্ড অ্যালয়জ লিঃ	৪·১৭	১·৬২
৫। বিহার অ্যালয়জ স্টীল লিঃ	০·০১	১·৭৯
৬। হিন্দুস্থান হেভি কেমিক্যালস লিঃ (কেশোরামের সাবসিডিয়ারি)	৪১·০৬	১১৬·৯৪
৭। মাইসোর সিমেণ্ট লিঃ	১৭৯·৯৫	৪৪৮·৯৩
৮। জয়শ্রী এক্সপোর্টস লিঃ	১·০০	৬৫·৫২
৯। মুন কর্পোঃ লিঃ	৫·০০	৮·২৩
১০। অটোমিটার্স লিঃ	১০·০০	৫৭·১৯
১১। লায়োনেল এডওয়ার্ডস লিঃ	১০·০০	২৫·২৫
১২। ইণ্ডিয়া স্টীম শিপ কোং লিঃ	২৭২·৫০	১৫৬০·৬৭
	মোট ৮৫৭·৩৭	৩০৩৪·১৬

বিড়লা গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর আদায়ীকৃত মূলধন ১৯৬৬-৬৭তে ১৯৬৩-৬৪ সালের থেকে ২৮ কোটি টাকা বেশি। আদায়ীকৃত মূলধনের এই বৃদ্ধিতে যে উৎসগুলো থেকে অর্থ যোগান হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই গোষ্ঠীর মাত্র ১০টি কোম্পানী সাধারণের কাছে ৪.৩ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার ছেড়ে প্রায় ৪.৬ কোটি টাকা তোলার জন্য মূলধনী বাজারের কাছে এসেছিল। এবং সাধারণের জন্য বাজারে ছাড়া শেয়ার মূল্যের প্রায় সমস্তটাই এল. আই. সি, আই. এফ. সি. আই. সি. আই. সি. আই প্রভৃতি আণ্ডার রাইটারদের আণ্ডার রাইট করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ২৩০ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল। কোম্পানীগুলো তাদের ডিরেক্টর ও তস্য বন্ধুদের জন্যে ১৫ লক্ষ টাকার শেয়ার ছেড়ে ছিল। যেটা বিবেচনার বিষয় তা হল এই, আদায়ীকৃত মূলধনের বৃদ্ধির বাকি পরিমাণ প্রায় ২৩.৫ কোটি টাকার অর্থ যোগান হল কী ভাবে।

আদায়ীকৃত মূলধন তোলার জন্য যে কোম্পানীগুলি মূলধনী বাজারের কাছে এসেছিল।

লক্ষ টাকার হিসাবে

	কোম্পানীর নাম	ক্যাপিটাল ইস্যু করার তারিখ	মোট পরিমাণ (শেয়ারের)	সাধারণের কাছে ছাড়া শেয়ারের মোট পরিমাণ
১।	হিন্দুস্থান গ্যাস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	৩/৬৫	১৪.৪৮	১৪.৪৮
২।	ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকশন এণ্ড ইকুইপমেণ্ট কোং লিঃ	১০/৬৩	১২.৫০	১২.৫০
৩।	ঐ	১২/৫৬	১৯.৮১	১৯.৮১
৪।	কেশোরাম ইণ্ডাষ্ট্রিজ এণ্ড কটন মিলস লিঃ	৩/৬৭	৯৯.৮৪	৯৫.৫৮
৫।	জয়শ্রী এণ্ড ইণ্ডাঃ লিঃ	৫/৬৩	২৯.১৬	২৪.৮০
৬।	ঐ	১০/৬৬	২৫.০০	২৫.০০
৭।	শ্রী এক্সপোর্ট হাউস লিঃ	১১/৬৪	৫.০০	৫.০০
৮।	জয়শ্রী টেক্সটাইলস এণ্ড ইণ্ডাঃ লিঃ	৩/৬৫	২৪.৫৯	২০.৭৬
৯।	ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্লাণ্টস লিঃ	৫/৬৫	৭৪.৯৪	৬০.০০
১০।	হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কর্পোঃ লিঃ	১১/৬৫	১৫০.০০	১৫০.০০
			৪৫৫.৩২	৪২৭.৯৯

গোষ্ঠি অন্তর্ভূক্ত কোম্পানীগুলোর সংরক্ষিত তহবিল ১৯৬৩-৬৪ সালের ৭৮ কোটি টাকা থেকে ১৯৬৬-৬৭তে বেড়ে দাঁড়াল ১১০ কোটি টাকা। কিন্তু কোম্পানীগুলোর ১৯৬৬-৬৭র ব্যালান্স সীটের অঙ্কগুলোতে দেখান সংরক্ষিত অর্থের অবস্থাটা হল মধ্যবর্তী সময়ে কোম্পানীগুলোর শেয়ার হোল্ডারদের বেনাম শেয়ার দেওয়া মারফৎ মূলধনেপরিণত করার পরের অবস্থা। আদায়ীকৃতমূলধনের বেশির ভাগ বৃদ্ধি, খোলাবাজারে শেয়ার বিক্রিতে যার হিসাব মেলে না। সেটা হয়েছিল আলোচ্য সময়ের মধ্যে সংরক্ষিত অর্থকে পুঁজিতে পরিণত করার ফলে। অর্থাৎ ঠিকমত বাদ-সাদ দিয়ে দেখা যাবে, আদায়ীকৃত মূলধন যেমন ৪-৫ কোটি টাকা বেড়েছে, একই সময়ে সংরক্ষিত তহবিল বেড়েছে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা।

আলোচ্য সময়ে গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিমাণ রীতিমত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৬-৬৭তে ১৫৯ টি কোম্পানীর বকেয়া স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ছিল প্রায় ১৯১ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪তে ১৫১টি কোম্পানীর ছিল ৮৭ কোটি টাকা। ১৯১ কোটি টাকার মধ্যে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৬৭ কোটি টাকারও বেশি। যেমন :—

কোটি টাকায়

উৎস	১৯৬৬-৬৭-র ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত বকেয়া ঋণ.
১। কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার	১১·৮
২। ব্যাঙ্ক :	
(ক) স্টেট ব্যাঙ্ক	২১·৫
(খ) অন্যান্য ব্যাঙ্ক	৫৬·৯ (স্বল্প মেয়াদী)
৩। অর্থমঞ্জরী প্রতিষ্ঠান :	
(ক) আই, সি, আই, সি, আই	২·৬
(খ) আই, এফ, সি	০·৯
(গ) এল, আই, সি,	০·৯
(ঘ) এন, আই, ডি, সি	০·৬
(ঙ) এম, পি, এফ, সি,	৯ লক্ষ মাত্র
৪। বৈদেশিক ঋণ	৬৭·৩
৫। অন্যান্য ঋণ, যথা, ম্যানেজিং এজেন্টস্, সাবসিডিয়ারি ও হোল্ডিং কোম্পানী, বাণিজ্য ও অন্যান্য জমা প্রভৃতি থেকে ঋণ	১৫·৪
৬। ডিবেঞ্চার	৮·৬
মোট	১৮৬·৫

আলোচ্য বছরে গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর লাভ বেড়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। ট্যাক্সের আগে লাভের স্তর ছিল ১৯৬৩-৬৪তে ২৭·৬ কোটি টাকা, ১৯৬৬-৬৭তে ৪২·৮ কোটি টাকা। এই অঙ্কটা দাঁড়িয়েছে ডেপ্রিসিয়েশন, ম্যানেজিং এজেন্ট ও ম্যানেজিং বা সারাক্ষণের ডিরেক্টর প্রভৃতির বেতন ইত্যাদি বাদ দিয়ে; কিন্তু ট্যাক্সের জন্য ব্যবস্থা রাখার আগে। ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৬-৬৭ সালে ম্যানেজেরিয়াল বেতন ও এজেন্সী কমিশন বাবদ ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৪·৫ কোটি টাকা ও ৭·০ কোটি টাকা। এই টাকাকে ট্যাক্সের আগের লাভের সঙ্গে যোগ করলে দাঁড়াবে ১৯৬৩-৪৬তে ৩২ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭তে ৫০ কোটি টাকা। মোট লাভ হল ১৯৬৩-৬৪র মোট সম্পত্তির ১০·৯ শতাংশ ও ১৯৬৬-৬৭র ৯·৫ শতাংশ। কিন্তু সমস্ত লাভটা শেয়ার হোল্ডারদের বন্টন করার জন্যে কোম্পানীগুলো পায় না। বাঞ্ছনীয় হল ডেপ্রিসিয়েশন ম্যানেজেরিয়াল পারিশ্রমিক ও ট্যাক্সের জন্য ব্যবস্থা রাখার পর লাভ নেওয়া। হিসাব করলে দেখা যায় এইভাবে উপনীত লাভের পরিমাণ ছিল ১৯৬৩-৬৪তে ১৬·৮ কোটি টাকা, ১৯৬৬-৬৭তে ২৯·৯ কোটি টাকা। আদায়ীকৃত মূলধনের অনুপাতে ১৯৬৩-৬৪তে ২১ শতাংশ, ১৯৬৬-৬৭ তে ২৮·৫ শতাংশ।

গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলো বিভিন্নপ্রকারের শিল্পে ছড়িয়ে আছে। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি। আলোচ্য সময়ে ১১টি শিল্প থেকে ১৯৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি ঘটেছে। যেমন :—

কোটি টাকায়

(১) শিল্পের নাম	১৯৬৩-৬৪ কোম্পানীর সংখ্যা	মোট সম্পত্তি	ট্যাক্সের পূর্বে মোট সম্পত্তি অনুপাতে লাভের শতকরা হার
১। আলুমিনিয়ম ও অন্যান্য ধাতব পণ্য	৩	২৪·৬	৬·২
২। জাহাজ	১	৩·৪	২·৮
৩। অটোমোবাইল ও সাইকেল	২	২৩·১	১২·৬
৪। মেশিনারি তৈরি (বৈদ্যুতিক ও পরিবহণ সংক্রান্ত ছাড়া)	৭	২২·৮	১৩·০

৫।	সূতি বস্ত্র	১৬	৬৯·৭	৯·৫
৬।	বিদ্যুৎ উৎপাদন	১	...	...
৭।	রেয়ন	২	২২·৩	১২·৭
৮।	কাগজ ও মণ্ড	২	২৯·৪	৪·৩
৯।	পাটের কাপড়	৬	১৬·৮	৭·৫
১০।	সিমেণ্ট ও সহযোগী শিল্প	১	১·৫	৩·৫
১১।	বৈদ্যুতি পণ্য	২	৬·৩	...
		৪৪	২১৯·৯	...

কোটি টাকায়

(২) কোম্পানী	সংখ্যা	১৯৬৬-৬৭ মোট সম্পত্তি	ট্যাক্সের পূর্বে মোট সম্পত্তি অনুপাতে মুনাফার শতকরা হার	মোট সম্পত্তির নীটবৃদ্ধি
১। ,,	৩	৬০·২	৭·৬	৩৫·৬
২। ,,	৩	২৫·৭	৩·৮	২২·৩
৩। ,,	২	৫০·১	৮·৬	২৭·০
৪। ,,	৭	৪২·৭	২·৭	১৯·৯
৫। ,,	১৬	৯১·৬	১২·৩	২১·৯
৬। ,,	১	১৭·৩	...	১৭·৩
৭। ,,	৪	৩৭·৮	১৭·১	১৫·৫
৮। ,,	২	৪১·২	৮·৯	১১·৮
৯। ,,	৫	২৪·২	৮·২	৭·৪
১০। ,,	২	১০·২	৭·০	৮·৭
১১। ,,	২	১৩·৮	৮·০	৭·৫
	৪৭	৪১৪·৮	...	১৯৪·৫

অর্থ লগ্নী কোম্পানীগুলির মোট সম্পত্তির পরিচয় :—

লক্ষ টাকায়

	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৩-৬৪ তুলনায় বৃদ্ধির শতকরা হার
আদায়ীকৃত	৫২৯.২ (২৮·৯)	৬৩১·৭ (২৯·৬)	২১·৩

মূলধন

সংরক্ষিত	৮১১'৫ (৪৪'৩)	৯৬৯'৪ (৪৫'৪)	১৯'৪
নীটমূল্য	১৩৪০'৭ (৭৩'২)	১৬০১'১ (৭৫'০)	১৯'৪
ঋণ	৩৪১'৯ (১৮'৭)	৩০৬'১ (১৪,৩)	(-) ১০'৫
অন্যান্য দায়	১৪৮'৩ (৮'১)	২২৮'৬ (১০'৭)*	৫৪'১
দায়িত্ব			
মোট সম্পত্তি	১৮৩০'৯	২১৩৫'৮	১৬'৬

অন্যান্য কোম্পানীগুলোর মতই, লগ্নীকারক কোম্পানীগুলোর আদায়ীকৃত মূলধন, সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যান্য আর্থিক উৎস আলোচ্য সময়ে বেড়েছে। মালিকানার তহবিল ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ১৩ কোটি টাকা। তার জায়গায় ১৯৬৬-৬৭তে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে যদিও ১৯৬৬-৬৭তে স্বল্প মেয়াদী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯৬৩-৬৪ সালের প্রায় সমান— ৩ কোটি টাকা। লগ্নী কারক কোম্পানীগুলোর শেয়ারের প্রায় ৯০ শতাংশের মালিক বিড়লা গোষ্ঠীর কর্পোরেট সংস্থাগুলো, ট্রাস্ট ও ব্যক্তি বিশেষ। ১৯৬৬-৬৭ বৎসরান্তে আদায়ীকৃত মূলধনের ক্ষেত্রে প্রায় ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পুরোপুরি প্রদত্ত হয়েছে গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর দ্বারা। এই গোষ্ঠীর লগ্নী কারক কোম্পানীগুলোর মোট সম্পত্তির ৮০ শতাংশের বেশি একই গোষ্ঠীর অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। বাকি ২০ শতাংশ ব্যবহার করা হয় গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানিগুলোকে ঋণ প্রভৃতি দেওয়ার কাজে।···২৯টি শিল্পে বৃদ্ধির পরিচয় :—

শিল্প অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টনের অবস্থা, সম্পত্তির নীট বৃদ্ধি

১৯৬৩-৬৪ লক্ষ টাকার হিসাবে

(১) শিল্পের নাম	কোম্পানীর সংখ্যা	মোট সম্পত্তি	প্রতি শিল্পে মোট সম্পত্তির শতকরা বিনিয়োগের হার
১। এ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য ধাতব পণ্য	৩	২৪৫৯'৪	৮'৮
২। অটোমোবাইল ও সাইকেল	২	২৩১২'৬	৭'৮
৩। শিপিং	২	৩৩৬'০	১'১
৪। সুতিবস্ত্র	১৬	৬৯৬৮'০	২৩'৮

৫।	মে সনারি নির্মাণ (বৈদ্যুতিক ছাড়া . ও পরিবহণ	৭	২২৮০'৮	৭'৭
৬।	বিদ্যুৎ উৎপাদন	১	...	...
৭।	রেয়ন	২	২২২৭'৫	৭'৫
৮।	কাগজ ও মণ্ড	২	২৯৪১'২	১০'০
৯।	রাসায়নিক ও সহযোগী শিল্প	১	১৫৩'৬	০'৫
১০।	পাটের কাপড়	৬	১৬৭৭'০	৫'৬
১১।	বৈদ্যুতিক পণ্য	২	৬৩২'৭	২'২
১২।	চিনি	৬	১০০৬'০	৩'৪
১৩।	ট্রেডিং ব্যবসায়	১৬	১০৪০'৪	৩'৫
১৪।	লগ্নী ও আর্থিক	৩৩	১৮৩০'৯	৬'৩
১৫।	শিল্পে ব্যবহৃত রসায়ণ	৪	৮৮১'৪	৩'১
১৬।	পশমী ও অন্যান্য কাপড়	২	২৯১'৪	১'০
১৭।	কয়লা ও অন্যান্য খনি	৫	২৯৭'৮	১'০
১৮।	ষ্টেশনারি ও প্লাষ্টিক পণ্য	৩	৩০১'২	১'০

* মোট সম্পত্তির অনুপাতে শতকরা হারের পরিচায়ক।

১৯।	প্রকাশণ ব্যবসা	৫	২১০'৮	০'৭
২০।	লৌহ ইস্পাত	২	২৪১'১	০'৮
২১।	অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য	২	৩২১'৩	১'১
২২।	বনস্পতি তেল	১	১৪৩'২	০'৫
২৩।	সম্পত্তি ব্যবসা	৯	১০০'২	০'৩
২৪।	কাঠ শিল্প	২	১১২'৪	০'৪
২৫।	বাগিচা	৭	৮৪'০	০'৩
২৬।	রবার শিল্প	২	৩'১	০'১
২৭।	বিমান পরিবহন	১	২'৯	০'১
২৮।	আন্যান্য খাদ্য পণ্য	২	১৮'৯	০'১
২৯।	ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবসা	৫	৪৪৯'১	১'৫

(২) ১৯৬৬-৬৭ সম্পত্তির প্রতি শিল্পে

	কোম্পানি সংখ্যা	মোট সম্পত্তি	প্রতি শিল্পে মোট সম্পত্তির শতকরা বিনিয়োগ হার	মোট নীট বৃদ্ধি	মোট বৃদ্ধিতে শতকরা সম্পত্তি বৃদ্ধি
*১। ”	৩	৬০'১৯	১১'৮	৩৫৬০'০	১৬'৪
২। ”	২	৫০১২'৪	১০'০	২৬৯৯'৮	১২'৫
৩। ”	৩	২৫৬৮'৭	৫'০	২২৩২'৭	১০'৩
৪। ”	১৬	৯১৬১'১	১৮'০	২১৯৩'১	১০'১
৫। ”	৭	৪২৭৩'৫	৮'৪	১৯৯২'৭	৯'২
৬। ”	১	১৭৩১'৬	৩'৮	১৭৩১'৬	৮'০
৭। ”	৪	৩৭৭৫'৬	৭'৪	১৫৪৮'১	৭'১
৮। ”	২	৪১২১'৯	৮'৩	১১৮০'৭	৫'৪
৯। ”	২	১০২২'০	২'০	৮৬৮'৪	৪'০
১০। ”	৫	২৪২৩'৭	৪'৭	৭৪৬'৭	৩'৫
১১। ”	২	১৩৭৫'৯	২'৭	৭৪৩'২	৩'৪
১২। ”	৬	১৫২৮'১	৩'০	৫২২'১	২'৪
১৩। ”	১৯	১৫৩০'৯	৩'০	৪৯০'৫	২'৩
১৪। ”	৩৩	২১৩৫'৮	৪'০	৩৪০'৯	১'৪
১৫। ”	৫	১০৫০'৭	২'০	১৬৯'৩	০'৮
১৬। ”	২	৪৫৬'০	০'৯	১৬৫'০	০'৮
১৭। ”	৪	৪৫০'৪	০'৯	১৫'৬	০'৭
১৮। ”	৩	৩৮৭'৪	০'৭	৮৬'২	০'৪
১৯। ”	৫	২৯৬'৮	০'৬	৮৬'০	০'৪
২০। ,,	৪	৩২১'৬	০'৬	৮০'৫	০'৪
২১। ,,	২	৩৭৭'২	০'৭	৫৫'৯	০'৩
২২। ,,	১	১৭২'৮	০'৩	২৯'৬	০'১
২৩। ,,	৮	১২৪'৬	০'২	২৪'৪	০'১
২৪। ,,	২	১২৬'৩	০'২	১৩'৯	০'১
২৫। ,,	৭	৯১'২	০'২	৭'২	০'১
২৬। ,,	২	৭'৩	০'১	৩'২	০'১
২৭। ,,	১	৪'১	০'১	১'২	০'১
২৮। ,,	৩	১৬'২	০'১	(—) ২'৭	০'১
২৯। ,,	৬	৪১৮'৫	০'৮	(—) ৩০'৬	(—) ০'১
	১৫৯	৫০৯৮১'৭	১০০'০	২১৬৫৭'২	১০০

মফতলাল গোষ্ঠীর :—১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে এই গোষ্ঠীর প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৬-৬৭তে কোম্পানীর সংখ্যা বেড়েছে মাত্র দুটি, আদায়ীকৃত মূলধন ও মোট সম্পত্তি বেড়েছে ১৯৬৩-৬৪র তুলনায় ১৮৫ শতাংশ ও ১৭৬ শতাংশ। যেমন :—

কোটি টাকার হিসাবে

	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে বৃদ্ধির শতকরা হার
কোম্পানীর সংখ্যা	২১	২৩	৯.২
আদায়ীকৃত মূলধন	১০.৩	২৯.৩	১৮৫.০
সংরক্ষিত তহবিল	১৫.৯	১৯.২	২১.১
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	নগণ্য	৩৫.৩	—
স্বল্পমেয়াদী ঋণ	৯.২	২৪.৪	১৬৪.৪
অন্যান্য দায়িত্ব ও ব্যবস্থা	১০.৫	১৮.৬	৭৬.৬
মোট সম্পত্তি	৪৫.৯	১২৬.৭	১৭৬.০
স্থায়ী সম্পত্তি	১৮.৯	৭৭.১	৩০৮.৩
টার্নওভার	৪৩.১	৭৭.৬	৮০.০
ট্যাক্সের আগে মুনাফা	৪.৬	৫.১	১২.৪
ট্যাক্সের পরে মুনাফা	২.৪	৩.৪	৪১.৫

১৯৬৬-৬৭তে গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর আদায়ীকৃত মূলধন বেড়েছে প্রায় ১৯ কোটি টাকা, মোট সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ৮০.৮ কোটি টাকা। দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ বেড়েছে ৩৫ কোটি টাকা ও ১৫ কোটি টাকা। মোট প্রযুক্ত পুঁজি যথেষ্ট পরিমাণ বাড়া সত্বেও গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানী গুলোর লাভ করার ক্ষমতার প্রান্তিক বৃদ্ধি ঘটেছে; ট্যাক্সের আগে লাভ বেড়েছে ৫৬ লক্ষ টাকা এবং ট্যাক্সের পরে লাভ এক কোটি টাকা। ট্যাক্সের পরে লাভের অপেক্ষাকৃত বেশি বৃদ্ধির কারণ হল ১৯৬৬-৬৭তে ট্যাক্সের জন্যে প্রয়োজন অপেক্ষা কম ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই গোষ্ঠীভুক্ত পুঁজির কাঠামো :—

	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৬-৬৭
১। মোট সম্পত্তির অনুপাতে আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা হার	২২˙৪	২৩˙১
২। মোট সম্পত্তির অনুপাতে মোট মূল্যের শতকরা হার	৫৭˙০	৩৮˙৩
৩। মোট সম্পত্তির অনুপাতে ঋণের শতকরা হার	২০˙১	৪৭˙১
৪। মোট সম্পত্তির অনুপাতে অন্যান্য দায়-দায়িত্বের শতকরা হার	২২˙৯	১৪˙৬
৫। মোট সম্পত্তির অনুপাতে স্থায়ী সম্পত্তির শতকরা হিসাব	৪১˙২	৬০˙৯

এই গোষ্ঠীর পুঁজির কাঠামো সংক্রান্ত চিত্র থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়, পুঁজির প্রয়োজনে অর্থ যোগান দিয়েছে মালিকানার পুঁজির তুলনায় ঋণ বাবদ অর্থই বেশি। এইভাবে গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর ১৯৬৬-৬৭তে ঋণের পরিমণ মোট সম্পত্তির ৪৭ শতাংশের কিছু বেশি, ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ২০ শতাংশ। মালিকানার পুঁজির মোট সম্পত্তির আনুপাতিক হার ১৯৬৩-৬৪র ৫৭ শতাংশের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭তে ছিল ৩৮ শতাংশ। তদনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তির যে পরিমাণটি ১৯৬৩-৬৪র ৪১ শতাংশের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭তে মোট সম্পত্তির ৬১ শতাংশ হয়েছে, সেক্ষেত্রে বৃদ্ধির বেশির ভাগ অংশেই টাকার যোগান করা হয়েছে ঋণ করা অর্থের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে।

২১টি কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ১০˙৩ কোটি টাকা। কতগুলো পুরানো কোম্পানী তুলে দেওয়া এবং কিছু কোম্পানী নেওয়া ও চালু করার ফলে ১৯৬৬-৬৭ তে এই কোম্পানীর মোট সংখ্যা ২৩। আদায়ীকৃত মূলধন সেই বছরে ছিল ২৯˙৬ কোটি টাকা। আদায়ীকৃত মূলধন বৃদ্ধির মধ্যে ৫ কোটি টাকা বেড়েছে তিনটি নতুন কোম্পানীর কাছ থেকে। বাকি ১৪ কোটি টাকা পুরানো কোম্পানীর।

১৯৬৬-৬৭তে নতুন তিনটি কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূললধনের অবস্থা :—

	আদায়ীকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)

১।	আমেদাবাদ জুপিটার স্পিনিং, উইভিং এণ্ড ম্যানু: কো: লি:	০'৯
২।	হয়েষ্ট ডাইজ এণ্ড কেমিক্যালস লি:	০'২
৩।	পলিওলেফিনস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লি: (নতুন কোম্পানী)	৩'৬
	মোট	৪'৭

পুরানো কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে ১৪ কোটি টাকা বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই পাওয়া যায় :—

		আদায়ীকৃত মূলধন বৃদ্ধি (কোটি টাকায়)
১।	ন্যাশনাল অর্গ্যানিক কেমি: ইণ্ডাষ্ট্রীজ লি:	১২'০
২।	মফতলাল গগলভাই এণ্ড কো: প্রা: লি:	১'০০
	মোট	১৩ ০০

১৯৬৩-৬৪তে ন্যাশনাল অর্গ্যানিক কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর আদায়ীকৃত মূলধন ছিল মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। ১৯৬৬-৬৭তে তা বেড়ে হয়েছে ১২ কোটি টাকা এবং গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর মোট আদায়ীকৃত মূলধনের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি।

গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানিগুলোর আদায়ীকৃত মূলধনের ক্ষেত্রে ১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধির অর্থ কোন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার বিশ্লেষণটি কৌতূহলোদ্দীপক। মনে হয় আলোচ্য সময়ে নতুন কোম্পানী সহ মাত্র ৪টি কোম্পানী প্রায় ৯ ০ কোটি টাকা তোলার জন্যে সাধারণের কাছে ৬'৩ কোটি টাকার শেয়ার ছেড়ে মূলধনী বাজারের কাছে এসেছিল। বাকি টাকাটা দিয়েছিলেন বিভিন্ন গোষ্ঠী-ভুক্ত কোম্পানির ডিরেক্টর ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা।

১৯৬৬-৬৭তে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৯'৬ কোটি টাকা, যেখানে ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ৯'২ কোটি টাকা। ঋণ করা তহবিলের ক্ষেত্রে এই বিরাট ৫০ কোটি টাকা জুগিয়েছে সরকারী অর্থ মঞ্জুরী প্রতিষ্ঠান সমূহ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও মোট সম্পত্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি সত্ত্বেও মফৎলাল গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিরাট কোন উন্নতি দেখা যায়নি। ১৯৬৬-৬৭তে গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর ৭৭'৬ কোটি টাকার টার্নওভার ১৯৬৩-৬৪ সালের স্তর থেকে ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি হলেও এই গোষ্ঠীর সমস্ত

কোম্পানীগুলোর ট্যাক্সের আগের লাভ ১৯৬৬-৬৭তে বেড়েছে ১৯৬৩-৬৪র থেকে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা বেশি। এর আংশিক ব্যাখ্যা মেলে এই ঘটনা থেকে যে, মোট সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৭৬ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় তিন বছরের টার্নওভারের বৃদ্ধি যথেষ্ট কম ছিল (এটা এজন্যও হতে পারে যে কটা গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানী তখনও প্রাথমিক গঠনের কাল কাটিয়ে উঠতে পারেনি)। কোম্পানীগুলোর ম্যানেজিং এজেন্সি কমিশন ইত্যাতি সহব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বেতন প্রভৃতির ১৯৬৩-৬৪র ৩১ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৬৬-৬৭তে ছিল ৩৩ লক্ষ টাকা। আবার সোল সেলিং এজেন্সি ও অন্যান্য সেলিং এজেন্সি কমিশনের পরিমাণ ১৯৬৬-৬৭তে ছিল ১৬ লক্ষ টাকা।

মফতলাল গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির দিক থেকে অধিকাংশ বিনিয়োগেরই হিসাব মেলে ১৯৬৩-৬৪ সালে তিনটি প্রধান শিল্প থেকে। ১৯৬৩-৬৪ স্তর অপেক্ষা ১৯৬৬-৬৭ গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলোর মোট সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৮১ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে ৭৯ কোটি টাকার হিসাব পাওয়া যায় দুটি শিল্পে অর্থ যোগানের মধ্য থেকে। যেমন :—

শিল্প অনুযায়ী সম্পত্তির বণ্টন ও সম্পত্তির নীট বৃদ্ধি লক্ষ টাকায়

(১) ১৯৬৩

শিল্পের নাম	কোম্পানী সংখ্যা	মোট সম্পত্তি	প্রতিশিল্পে মোট সম্পত্তির অনুপাতে বিনিয়োগের শতকরা হার
*১। রাসায়নিক ও সহযোগী পণ্য	৩	৮৬৫.২	১৮.৪
২। সুতিবস্ত্র	৬	২৬৭১.৯	৫৮.২
৩। চিনি	১	১৬৭.৬	৩.৬
৪। বীমা	১	২২.২	০.৫
৫। পাট তৈরি	১	১৯৭.৯	৪.৩
৬। লগ্নী ব্যবসা	১	৫৬৮.২	১২.৪
৭। কাঠ শিল্প	১	৭০.১	১.৫
৮। কনসালটেন্সি ও বিজনেস সার্ভিস	১	২.৮	০.১
৯। মুদ্রণ ও এনগ্রেভিং	১	৩.০	০.১
১০। ম্যানেজিং এজেন্সি	৫	৪২.৭	০.৯
মোট	২১	৪৫৯১.৬	১০০.০

(২)		১৯৬৬-৬৬			লক্ষ টাকায়
শিল্পের নাম	কোম্পানী সংখ্যা	মোট সম্পত্তি	প্রতিশিল্পে মোট সম্পত্তির অনুপাতে বিনিয়োগের শতকরা হার	সম্পত্তির নীটবৃদ্ধি	প্রতিশিল্পে মোট বৃদ্ধির অনুপাতে সম্পত্তি বৃদ্ধির শতকরা হার
*১। ,,	৪	৫৬৭৪·০	৪৪·৮	৪৮২৮·৮	৫৯·৮
২। ,,	৭	৫৭৬৩·৭	৪৫·৫	৩০৯১·৮	৩৮·৩
৩। ,,	১	২৪৩·৬	১·৯	৭৬·০	০·৯
৪। ,,	১	৬৬·০	০·৫	৪৩·৮	০·৫
৫। ,,	১	২৩৬·০	১·৯	৩৮·১	০·৪
৬। ,,	১	৫৮০ ৪	৪·৬	১২·২	০·১
৭। ,,	১	৭০·৭	০·৫		
৮। ,,	১	৩·০		০·২	
৯। ,,	১	২·৮		—০·২	
১০। ,,	৫	৩১·২	০·৩	—১১·৫	
মোট	২৩	১২৬৭১·৪	১০০·০	৮০৭৯·৮	১০০·০

টাটা, বিড়লা, মফতলাল। কয়েক বছরে মোট সম্পত্তি টাটাদের বেড়েছে ৩২ শতাংশ; বিড়লাদের ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ আর মফতলালের ক্ষেত্রে ১৭৬ শতাংশ। কিন্তু স্থায়ী সম্পত্তি টাটাদের ক্ষেত্রে বেড়েছে ২৪·৫ শতাংশ, বিড়লাদের ৮০ শতাংশ, মফতলালের ৩০৮ শতাংশ। লাভের ব্যাপারে উন্নতি বিড়লাদের, ট্যাক্সের পরে টাটাদের লাভ পড়ে গেছে। টাটাদের ১৯৬৬-৬৭তে ট্যাক্সের জন্যে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল তা ট্যাক্সের আগের মোট লাভের ৫০ শতাংশ। বিড়লাদের এক-তৃতীয়াংশ। মফতলালের ক্ষেত্রেও তাই। সামগ্রিকভাবে বিড়লা তাদের ট্যাক্স পূর্ববর্তী-লাভে ৭৮ শতাংশ উন্নতি লাভ করেছে। মফতলালের ৪২ শতাংশ। যেমন:—

১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে বৃদ্ধির শতকরা হার

	টাটা	বিড়লা	মফতলাল
(১) কোম্পানীর সংখ্যা	—	৫·৩	৯·২
(২) আদায়ীকৃত মূলধন	২৪·৪	৩৬·৯	১৮৫·২

১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে বৃদ্ধির শতকরা হার

		টাটা	বিড়লা	মফতলাল
(৩)	সংরক্ষিত তহবিল	১১.৯	৪০.৯	২১.১
(৪)	ঋণ	৫১ ২	১১৯ ০	৫৪৮.০
(৫)	অন্যান্য দায় দায়িত্ব	৩৩.১	১০০.০	৭৬ ৬
(৬)	মোট সম্পত্তি	৩১.৭	৭৩.৮	১৭৬.০
(৭)	স্থায়ী সম্পত্তি	২৭ ৫	৭৯.৯	৩০৮.৩
(৮)	টার্ন ওভার	৩৬.৫	৫৬.৮	৮০.০
(৯)	ট্যাক্সের আগে লাভ	১৮.৮	৫৫.৫	১২ ৪
(১০)	ট্যাক্সের পরে লাভ	—১৫.৯	৭৮ ০	৪১ ৫

বিগত তিনটি পাঁচ শালা পরিকল্পনায় (চারটিও ধরা চলে, এবং পঞ্চমে পড়েছে) ভারতবর্ষের হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নী করা হয়। লক্ষ করার বিষয় এই বিপুল অর্থ সাধারণ মানুষের বৈষয়িক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাতে পারেনি (বরং হাড়ির হাল করে ছেড়েছে) কিন্তু মুষ্টিমেয় বণিক রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

১৯৬০ সালে অধ্যাপক মহলানবীশের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেন, পরিকল্পনাজনিত সমৃদ্ধির সিংহভাগই বৃহৎ শিল্প বাণিজ্যপতিদের পকেটে গিয়ে ঢুকেছে এবং গত পনেরো বছর তারা বিরাট বাণিজ্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বনে গেছে। এই সাম্রাজ্য বিস্তারে মদত যুগিয়েছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন এ স্টেট ব্যাঙ্ক। এবং সবকটি লগ্নীসংস্থাই জনসাধারণের অর্থে গঠিত ও সরকারী কর্তাদের দ্বারা পরিচালিত।

১৯৬৪ সালে একটা মনোপলি কমিশন গঠন করা হয়। তাঁদের রিপোর্ট : দেশ একচেটিয়া কারবারীদের হাতে চলে যাচ্ছে।

পরিকল্পনা কমিশন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. কে. হাজারীকে তদন্তের ভার দিলেন, কি করে দেশ একচেটিয়া কারবারীদের হাতে যাচ্ছে, বা গেল। অধ্যাপক হাজারীর রিপোর্ট : শিল্প বাণিজ্য লাইসেন্স প্রদানের সরকারী নীতিই (অবশ্যই দুর্নীতি) দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মাৎস্যন্যায় সৃষ্টি করেছে। ছোট ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের দাবি অগ্রাহ্য করে অর্থ মন্ত্রণালয় উদার হাতে (অবশ্যই কর্তরা ব্যাক্তিগত লাভের কড়ি গুণে নিয়ে) .

পণ্ডিত নেহেরু ১৯৪৮ সালে জাতির উদ্দেশে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন :

"…নতুন যে সব উদ্যোগ একচেটিয়া ধরনের কিংবা তাদের কাজের পরিধির দিক থেকে সামগ্রিক ভাবে সারা দেশ জুড়ে কাজ করে অথবা একটি প্রদেশের চেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে ব্যবসা করে, সেগুলি সরকারি মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে…"

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। চেয়ে দেখলাম আমার সামনে বাণী দাঁড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টিতে ভয় এবং বিস্ময়ের মাখামাখি। আমাকে ওর দিকে তাকাতে দেখে প্রশ্ন করল ও, 'কি হল রুদ্র, চিৎকার করে উঠলে কেন?'

আমি ওর দিকে আবার চাইলাম। ওকে দেখলাম। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। বরং আমার চোখের সামনে সেই সব ছবি আবার ভেসে উঠল। কানে এল অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর।

অদ্ভুত সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নিজেকে অলস মনে হচ্ছিল। শুয়ে পড়েছিলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম আমাদের বাড়ির গৃহস্থলির নানান বিচিত্র শব্দ এবং কথপোকথন। শুনতে শুনতেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যেই দেখতে পেলাম একটা সম্পূর্ণ নতুন এবং সুপরিচিত পরিবেশ এবং আমার সঙ্গে বাণীও রয়েছে।

জায়গাটা বেশ সুন্দর। আমার খুবই ভাল লাগছিল। বেশ গাছপালা, মাঠ, একটু আগে নদীও দেখেছি, কিছু ভাঙ্গাচোরা চালা বাড়িও পার হয়ে এসেছি। ঘাস ছিল। কিছু ফুল, পাখী এবং ক'টা প্রজাপতিও দেখলাম। বাণীর চোখেমুখেও মুগ্ধতা।

তারপর ক'টা মানুষের আকৃতি আমার দৃষ্টিগোচর হল। ইংরাজী জঙ্গল পিকচার্সের জঙ্গলীদের মত তারা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে লাজুক লাজুক দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল। আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।

সেই অনেক দিন আগের ইংরাজী ছবিটার সাহেব অভিনেতার মত ইসারা করলাম আমি। প্রথমে মূর্তিগুলো আসতে চাইল না। কি যেন ইসারা করতে লাগলো। বুঝলাম বাণীকে দেখাচ্ছে ওরা। যাহোক বাণী বোধ হয় ওদের ইসারা বুঝতে পারল। আমার কাছ থেকে খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়াল ও। আর তার পরই এক কথায় যা দেখলাম তার নাম বোধহয় অপূর্ব। পুরুষ হয়ে

পুরুষের সৌন্দর্য দেখলাম আমি। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ওরা বলল, 'তুমি কে?'

আমি নিজের নাম বললাম।

ওরা বলল, 'তুমি খুব সুন্দর।'

বললাম, 'তোমরা আমার চেয়েও সুন্দর।'

ওরা বলল, 'আমরা তোমার পোষাকের কথা বলছি।'

বললাম, 'এ আর এমনকি, এর চেয়ে অনেক সুন্দর পোষাক পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রতি সহরে যত দিন যাচ্ছে শরীর ঢাকার জন্মে পোষাকের দোকান শুধু বাড়ছে। কিন্তু তোমাদের মত এমন সৌন্দর্য পোষাকে নেই।'

আমার কথা শুনে ওরা নিজেদের মধ্যে নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। সেই অবসরে আমি বাণীর দিকে চাইলাম। কিন্তু বাণীকে ঘিরে সেখানে অসংখ্য সুন্দরী নারীর ভিড়। তারা শুধু বাণীকে দেখছে আর দেখছে। দেখছে বাণীর পরনের পোষাক। সূক্ষ্ম এবং সুন্দর পোষাকে বাণীর যৌবন উগ্র! ঢাকাই মসলিনের কথা ইতিহাসে পড়েছি। বোধ হয় তার চেয়েও সূক্ষ্ম কাপড় বাণীর পরনে। পাওয়া যায়। অফুরন্ত ভাণ্ডার (কিন্তু মোটা কাপড়ের আজ বড় অভাব। পাওয়া গেলেও গরীবের মোটা কাপড় দর নাগালের বাইরে। অথচ অনেক দিন হল সরকার মোটা কাপড়ের দর বেঁধে দিয়েছেন—সেই সঙ্গে নিম্নতম উৎপাদনসীমাও। এবং দাম কণ্ট্রোল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মোটা কাপড় বাজার ছাড়া। এবং বাজার ছাড়া কাপড়ের কণ্ট্রোল দামটা কি হবে তা একমাত্র জানে সরকার। তার ওপর সেই দাম ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রকের সুপারিশে আরো সাড়ে সাঁইত্রিশ শতাংশ (মার্চ ১৯৭৪) চড়েছে।

মোটা কাপড়ের দরে প্রথম কণ্ট্রোল ঘোষিত হয় ১৯৬৪ সালে, আর শেষ কণ্ট্রোল দরের সরকারী ঘোষণা বেরোয় মার্চ ১৯৭৪-এ। অবশ্যই কিছু বাড়তি দরের লেবেল এঁটে এবং ১৯৬৮ সালের দরের চেয়ে সাড়ে সাঁইত্রিশ শতাংশ বেশি। এর ফলে মিলের প্রাপ্য হল ৩০ শতাংশ ও বিক্রেতাদের সাড়ে সাত শতাংশ। অবশ্যই মিলগুলোকে মোটা কাপড়ের উৎপাদন বাড়াতে বলা হল।

১৯৬৮ সালে ধরা হয়েছিল ৪০০০ লক্ষ মিটার মোটা কাপড় মিলগুলোকে তৈরি করতেই হবে। ৭৪-এর ঘোষনায় ৮০০০ লক্ষ মিটার। এবং যথারীতি

হৈ-চৈ পড়ে গেল মিলের জগতে। কাগজে কাগজে বিবৃতি—দাম বড় কম বাড়ানো হয়েছে। আমেদাবাদ, বোম্বাইয়ের কর্তাব্যক্তিরা বলল, দাম বাড়ানো উচিত ছিল, ১১৫ শতাংশ কারণ উৎপাদন খরচ দারুণ বেড়ে গেছে এবং দাম বেঁধে দেওয়ার পর থেকেই মিল মালিকেরা মোটা কাপড়ের উৎপাদন কমিয়ে ফাইন, সুপার ফাইন কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে দিল। দামের কণ্ট্রোল হওয়ার পরের বছর মোটা কাপড়ের উৎপাদন ছিল ৮০৩০ লক্ষ মিটার, ৬৬ সালে ৭২০০ লক্ষ মিটার, ৬৭ সালে ৬৮৩০ লক্ষ মিটার, কমতে কমতে ৭১ সালে ৫০৩০ লক্ষ মিটার (অবশ্যই ৬৪-৬৫ সালে তুলনায় দেশে জনসংখ্যা এবং গরীবের সংখ্যা বেড়েছে)। কিন্তু সরু কাপড়ের উৎপাদন বেড়েছে। ফাইন, সুপার ফাইন। বেশি দামের কাপড়ের উৎপাদন ৬৬ সালে ছিল ৩৯৮০ লক্ষ মিটার—৭১-এ ৬৬৩০ লক্ষ মিটার। অবশ্যই লাভের কড়ি বাড়ানোর জন্যে এবং সরু কাপড়ের উৎপাদর আরো বাড়ছে।

অবশ্য সস্তার কাপড় তৈরী না করার জন্যে ৬৮ সালের আইন অনুযায়ী মিল থেকে নির্ধারিত পরিমাণের এক মিটার মোটা কাপড় কম তৈরী হলে প্রতি মিটারে ১ টাকা ফাইন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এবং ফাইন দিয়ে সরু কাপড় তৈরী করেও মিল মালিকদের লাভের পড়তা কমে নি।

মোটা কাপড়ে লাভ থাকছে না। চিৎকারের পর দেখা যায় মিলগুলোর লাভের অঙ্ক না কমে বরং বেড়েছে। যেমন—

বিক্রয়ের শতকরা লাভ

১৯৬৫-৬৬ :	৪.৯
১৯৬৭-৬৮ :	৫.৪
১৯৬৮-৬৯ :	৪.৪
১৯৬৯-৭০ :	৬.১
১৯৭০-৭১ :	৬.০

এবং ১৯৭১-৭২ ও ৭৩ সালের না পাওয়া গেলেও কাপড়ের কলের শেয়ারে মূল্যের উর্ধগতি। ১৯৭৪ সালের মার্চের শেষে কাপড়ের কলের শেয়ারের সর্ব-ভারতীয় সূচক ছিল ১৬৪, ১৯৭৩-এ ছিল ১২৪ এবং ১৯৭৪ সালে মার্চ মাসে সব পণ্যের শেয়ার মূল্যের সূচক ছিল ১৫৫।

১৯৬৫ সালে সারা ভারতে কাপড়ের মিলের সংখ্যা ছিল ৫৪৩, ১৯৭১-এ

৬৪৪, ১৯৭২-এ ৬৭০, ১৯৭৩-এ ৬৮৮। কিন্তু আশ্চর্য, সব রকম মিলিয়ে মোট উৎপাদন কমে গেছে। ১৯৬৫তে মোট উৎপাদন ৪৫৮ কোটি মিটার, ১৯৭২-এ ৪২৫ কোটি মিটার এবং এর একমাত্র কারণ গরীবদের পরনে মোটা কাপড়ের উৎপাদন কমিয়ে ফেলা এবং মিল মালিকদের আবদার কাপড়ের দাম আরও বাড়াতে হবে এবং বন্ধ করতে হবে কম উৎপাদনের জন্য ফাইন দেওয়ার ব্যবস্থা। তাহলেই নাকি মোটা কাপড়ের উৎপাদন বাড়বে। ১৯৭২ সালের মহারাষ্ট্রের কাপড় কলগুলোর লাভ ছিল ৩৮·৫০ কোটি টাকা, ৭৩-এ ৫৩ কোটি টাকা। ৭৪-এ মন্দার নামে শ্রমিক ছাঁটাই। কারণ কাপড় কেনার লোক নেই।

আমি ওদের দেখছিলাম। বাণীকে দেখছিলাম। আর বাণীকে ঘিরে যারা তাদের।

ওরা বলল, 'তুমি অমন করে কি দেখছো বলতো?'

বললাম, 'তোমাদের সৌন্দর্য।'

ওরা একটু ভেবে বলল, 'তুমি আমাদের মত সুন্দর হবে?'

কথাটা শুনেই আমার কান গরম হয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা। বাণীর সামনে···আমি চুপ করে রইলাম।

ওদের একজন বলল, 'কি হল চুপ করে রইলে কেন?'

বললাম, 'আমার লজ্জা করবে।'

ওরা বলল, 'লজ্জা কিসের? কোন লজ্জা নেই। আর তোমরা বোধ হয় জান না, আমাদের এখানে, বলতে পার আমাদের এই রাজ্যে—এখানে এলে আমাদের মতই থাকতে হবে।'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমরা থাকতে আসিনি। এখনি চলে যাচ্ছি।'

ওরা বলল, 'তাহলে তোমাদের পোষাকগুলো রেখে যাও। ভয় নেই, ওসব আমরা পারবো না, শুধু স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দেব।'

বললাম, 'দোহাই তোমাদের অমন কোর না। আমরা তাহলে সভ্য সমাজে ফিরে যেতে পারবো না।

ওরা অবাক হয়ে বলল, 'ফিরে যেতে পারবে না কেন?'

বললাম, 'ফিরে যাওয়ার অনেক অসুবিধা। মানে তোমরা আমাদের যেমন করে দেবার কথা বলছো, যদি সত্য-সত্যই তাই কর তাহলে আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।'

ওদের মধ্যে একজন ছোকরা এবার এগিয়ে এল। বলল, 'আমরা কি করে আছি?'

প্রমাদ গুনলাম। জানি ছেলে-ছোকরাদের মনমেজাজ চিরকালই একটু গরম ধরনের। অবশ্য কিছু আছে গরম ঠাণ্ডা মিশিয়ে। আবার খুবই ভাবপ্রবণ। দাদা জিন্দাবাদ অনেক দেখছিতো। সেই দাদা যদি মদখোর মাতাল এমন কি নিত্য নতুন মেয়ে নিয়ে একটু খেলাটেলাও করেন, তবু দাদা জিন্দাবাদ তো দাদা জিন্দাবাদ। দাদা লোকটা নয়, ওই দাদা নামটাই ছেলে-ছোকরাদের কাছে আসল।

একটু ভেবে চিন্তে নিয়ে বললাম, 'মানে আমি বলতে চাইছি…।'

ছোকরা আমাকে ঝাঁকি মেরে থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক আর সাফাই গাইতে হবে না। তোমাদের সভ্য সমাজটা আমার বেশ কয়েকবার দেখা আছে। আমাদের নেংটিসার ঠিক কথা কিন্তু তোমাদের? পোষাক পরেও তোমরা শরীর দেখিয়া বেড়াও। তোমাদের মেয়েগুলো শুধু পোষাক পরে শুধু খদের ডাকার মত—তাকে সকলে দেখুক। তোমাদের দেওয়ালের কিসের সব ছবিতেও ন্যাংটামো। তোমরা যে কি ধরনের সভ্য তোমরাই জান। আমাদের নেই—কিন্তু তোমাদের থাকা সত্বেও শরীর দেখাও।'

কথাগুলো বলে ছোকরা নিজের মনেই গজ-গজ করতে লাগল। সেই সুযোগে আমি বললাম, 'আমরা তাহলে যাই?'

ওরা বলল, 'নিশ্চয় যাবে। তোমাদের ধরে রাখলে যেতে দিতে হবে। পারবো না আমরা। কারণ আমাদের থাকতেও নেই। তবে যাবার আগে তোমাদের সুন্দর পোষাকগুলো আমাদের কাছে রেখে যাও।'

কথাগুলো শেষ করেই ওরা আমার দিকে এগিয়ে এল। দেখলাম বাণীর দিকেও এগিয়ে যাচ্ছে ঘিরেধরা মূর্তিগুলো। পরনে নেংটি। বুক খোলা। বীভৎস দৃশ্য। আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম।

বাণী বলল, 'কি হল কথা বলছো না কেন?'

আমি বাণীকে ভাল করে দেখলাম। স্বপ্নের কথাটা আবার মনে পড়ল। স্বপ্ন! আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু…যদি সত্যই কোন দিন… আমি ভাবতে পারলাম না।

বাণী ডাকল, 'রুদ্র।'

আমি ওর দিকে চাইলাম।

—'কি হয়েছে তোমার ?'

হঠাৎ আমি হেসে ফেললাম। আগে আমি যেমন ভাবে হাসতাম। আর দেখলাম, আমার হাসি দেখে বাণীর ভয় পেয়েছে। ও বোধহয় ভুলে গেছে অতীতটাকে। আমার আজকের অবস্থাটাই বিশ্বাসরূপে নিশ্চয় ওর মনে শিকড় গেড়ে বসে গেছে। আর নিশ্চয়ই এবার পালিয়ে যাবে আমার সামনে থেকে। পাগলকে সকলেই ভয় পায়।

কিন্তু আমার সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়া হল না ওর। ললনা আমার ঘরে এল। ওর দুহাতে দুটো থালা। লুচি ভেজে দিয়েছে বড় বউদি নিশ্চয়। বাণী কিছু বলার আগেই মেয়েটা বলল, 'জেঠিমা বলল, সোজা স্কুল থেকে এসেছেন আপনি, খেয়ে নিন। আর ছোটকা তুমিও খেয়ে নাও।'

কথা বললাম আমি, 'আমি এখন খাব না।'

—'কেন খাবে না কেন ?'

—'আমার এখন একটুও ক্ষিদে নেই।'

মেয়েটা আমার কথা বোধহয় বিশ্বাস করল। ঃএকটা থালা সামনের টেবিলে রেখে বাকিটা নিয়ে গেল। জল এনে দিল। যাবার সময় বলে গেল চা নিয়ে আসছে।

বাণী চেয়ারে বসে আছে। ওর সামনে খাবারের থালা। বললাল, 'ঠাণ্ডা হবার আগেই খেয়ে নাও।'

ও চকিতে একবার আমার দিকে চাইল। বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত সে-দৃষ্টি। ও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বুঝতে পারছি কষ্ট হচ্ছে ওর। ডাক্তারের কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মেডিক্যাল সায়েন্স কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারে ? অন্ততঃ তিন চার জন ডাক্তার বেশ কবার আমাকে পরীক্ষা করেছে যন্ত্রতন্ত্র দিয়ে। সিদ্ধান্তে এসেছেন। ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছেন। কিছু কিছু উপদেশ দিয়েছেন। ফলে বাণীর কাছে মেজদার অনুরোধ, পুরানো দিনের কথা মনে রেখে আমার ভাইকে একটু সঙ্গ দাও। ও হয়তো আরোগ্য-লাভ করতে পারে। আর সেই জন্যেই বাণীর বার বার ছুটে আসা। হয়তো আরো কিছু আছে। অনেক দিন আগে এমন ধরনের একটা ছবি দেখেছিলাম বাণী আমি দুজনেই। যেন ঠিক সেই রকম ব্যাপারটা। কিন্তু বাণী যেন কেমন খেই হারিয়ে ফেলেছে। ওর যেন সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

বাইরে বিকেল হতে কিছু দেরি আছে। পাখাটা জোরেই চলছে। তবু

বাণীর ফরসা-ফরসা মুখটা ঘামছে। কিছুটা অন্যমনস্ক। অজান্তেই যেন থালার গোল হয়ে ফুলেওঠা লুচিগুলো নাড়াচাড়া করছে।

বললাম, 'ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।'

বাণী চমকে আমার মুখের দিকে চাইল। বলল, 'তুমি!'

—'আমি পরে খাব।' আমার গলাটা গম্ভীর। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম।

ও চুপ করে রইলো। খেতে সুরুও করল না। বুঝতে পারলাম ওর খাবার ইচ্ছা নেই। অথচ আমি জানি ওর নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে। আর এও জানি ও একেবারে ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না। আগে আমিও খুব একটা ক্ষিধে সহ্য করতে পারতাম না। যা-তা খেতাম না। কিন্তু দীর্ঘ আঠারো মাসের প্রবাস-জীবনে সব সহ্য হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে আমি এখন ময়দানের ঘাস বা ডাস্ট-বিনের ফেলে দেওয়া ভুক্তাবশিষ্ট যা আমাদের দেশের স্বেচ্ছাচারী নাগরিকদের একচেটিয়া অধিকারে তাও একটু কষ্ট করে খেতে পারি।

আর বাণী, যার নাম ফুলকো লুচি, তা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এবং যে বস্তুটি দিয়ে ওগুলো ভাজা সেই জিনিষটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসে এবার মেজদা সজোরে ঘোষণা করেছিল, 'বউদি সামনের মাসের ফর্দে ডালডার কথাটা বাদ দেবে। যে কোন একটা হলে যদি চলে তাহলেই আসবে না হলে এই শেষ।'

বউদি বলেছিল, 'কেন পাওয়া যাচ্ছে না?'

—'পাওয়া যাবে না কেন? প্রথমত হায়রানি, দ্বিতীয় দরে আর পোষাচ্ছে না। দরের চেয়ে হায়রানিটাই অসহ্য। হাতি ঘোড়া বাঘ সব মার্কাই আছে। নেই তোমার মার্কা দেওয়াটাই। অফিসের পর অত খোঁজাখুঁজি সহ্য হয় (১৯৭৪ সালের জুন মাসে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট কে. কে. বিড়লা একটা প্রেসনোটে বলেছিলেন: **If Production falls, the consumer would not be able to get adequate supplies।** অতএব করণীয় কি, না, বনস্পতির বাজার দর বাড়িয়ে দিতে হবে এবং মেট্রিক টন প্রতি ৩০০০ টাকা মাত্র। তাহলে আর উৎপাদন কমবে না, আর ক্রেতারাও মাল খুঁজে হায়রান হবে না।

সরকার বনস্পতি শিল্পকে সস্তায় আমদানীকৃত তেল সরবরাহ করতেন। বাজারে যখন বাদাম তেলের দর কুইণ্টাল ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকা তখন সরকার ওই শিল্পের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ তেলের চাহিদা মিটিয়েছেন ৩৫০ টাকা

কুইণ্টালে তেল সরবরাহ করে।

সরকার বললেন, সস্তায় আর তেল দেবেন না। মালিকরা তেলের বাজারের দিকে ঝুঁকলেন। ফলে বাজার চড়তে সুরু করল রাতারাতি। ১৯৭২ সালের মে মাসে বোম্বাইয়ের খোলা বাজারে এক কুইণ্টাল বাদাম তেলের বাবদ দর ছিল ৬৯৪ টাকা, ৭৩ এর মে মাসে ৭৬৬ টাকা, মাঝে কিছুটা নামল। নভেম্বরে হল ৬২৭ টাকা, ডিসেম্বরে ৭৪০ টাকা। ৭৪ এর জানুয়ারিতে ৭৭৭ টাকা, ফেব্রুয়ারিতে ৭৬৭ টাকা, মার্চে ৮১৫ টাকা, জুনে ৮৫৫ টাকা কুইণ্টাল।

সুখের সংসারে লাভের কড়ি গুণতে উৎপাদকদের অসুবিধা হয়নি। তার পরই গেল গেল রব। দুশ্চিন্তা খদ্দেরদের অসুবিধার কথা চিন্তা করেই। কিন্তু সস্তায় তেল পাবার সময় উৎপাদন কতটা বেড়ে ছিল?

১৯৭২ সালে বনস্পতির গড়ে পড়তা মাসিক উৎপাদন ছিল ৫০ হাজার ২০০ টন। ৭৩ এ নেমে দাঁড়াল ৩৮ হাজার ৮০০ টন। অবশ্যই এ সময় সস্তায় তেল দিয়েছেন সরকার।

১৯৭৪ সালে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত গড় উৎপাদন ৩৫ হাজার টন। মে মাসে ২৫ হাজার টন। এখন খেয়াল খুশি মত উৎপাদন।

১৯৬৮ সাল থেকে সরকার বনস্পতির দাম বেঁধে দেন। দেশকে চারটে অঞ্চলে ভাগ করে, খোলা বাজারে খাবার তেলের দামের ওঠা-পড়ার হিসাবে বনস্পতির দাম পনেরো দিন অন্তর ঠিক হ'ত এক অঞ্চলের জন্যে। এখনও মাঝে মাঝে কাগজে ঘোষণা হয় দাম কিন্তু সে দামে পাওয়া যায় না। মহাজনের দল অবশ্যই পাকা রশিদ দেয় পাকা দামে কিন্তু গাঁটের কড়ি গুণতে হয় বেশ কিছু বেশি।

আর সস্তায় পাওয়া ব্যারেল-ব্যারেল তেল রাতারাতি পাখনা মেলে উৎপাদকের ঘর থেকে গিয়ে ঢুকে পড়তো কালো বাজারে। উৎপাদন কম হলে বাজার থাকবে তেজী। লাভ দুদিকেই।

১৯৭৩ সালে উৎপাদন কমতে শুরু করে। দর ৭ টাকা ৯০ পয়সা কিলো। রেট। কালো বাজারের দর ১২।১৩।১৪ টাকা মাত্র। তারপর ফেয়ার প্রাইস সপ। ভাগ্যবানের দল পেল ছিটে ফোঁটা। আর গরম হল বাজার। কালোবাজার রইলো চড়া। যেটা না থকেলেই নয়।

সরকারের ধ্বনি; উৎপাদন বাড়াও দাম কমবে। কিন্তু উৎপাদন বাড়লেও দাম কমে না। দাম কমে বাড়ে ব্যবসাদারদের মর্জিতে। কালো বাজারীদের

ল্যাম্প পোষ্টে ঝোলান আজও হয়নি।

বানী খায়নি, চুপ করে বসে আছে। লনা চা নিয়ে এল। আমার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'কি হল আপনি চুপ করে বসে আছেন যে?'

বানী লনার দিকে চাইল। বলল, তুমি এগুলো নিয়ে যাও লনা।'

—'খাবেন না?'

বানী চুপ করে রইলো। লনা কি বুঝল সেই জানে, মুখটা আড়াল করে মুচকি হেসে খাবারের ডিসটা তুলে নিল। চলে যাবার সময় বলল, 'চা খেয়ে আপনি আসুন।'

লনা চলে যেতে আমি আর বানী। আমরা দুজন। কিন্তু আজ আমাদের মুখে কথা নেই। আমাদের মধ্যে কিসের যেন একটা অদৃশ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে। আমরা সহজ হতে পারছি না।

বানীর চোখে মুখে স্পষ্ট বেদনার চিহ্ন। আমার কেমন যেন কষ্ট বোধ হতে সুরু করল। মাথার মধ্যে যেন পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। রাগ, একটা দুরন্ত আক্রোশ জাগছে বুকের মধ্যে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল আমার। বলি, আমি পাগল নই। আমার কিছুই হয়নি। আমি সুস্থ-স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বাস করবে না। আমাকে আজ কেউ বিশ্বাস করবে না।

—'জানিস, এভাবে আমার আর ভাল লাগছে না।'

ও পাশে পাশে হাঁটছিল, শুধু একবার চোখ তুলে চাইল আমার দিকে।

বললাম, 'কিরে কথাটা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না তোর?'

ও গম্ভীর ভাবে বলল, 'অবিশ্বাস করবো কেন?'

—'বিশ্বাস কর, সত্যিই আমার আর ভাল লাগছে না। হাঁফিয়ে উঠছি দিন দিন।'

ও কোন উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগল।

আমি আর লনা। গতকাল ওর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমার সম্পর্কে ভয় কেটে গেছে ওর। আমরা দুজনেই বেশ সহজ। ও বিশ্বাস করে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। দুপুরে খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই বিকাল পর্যন্ত ট্রামে বাসে চড়েছি। ঘুরেছি অনেক। হেঁটেছি বড় কম নয়। আমার ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে গতকাল এক ফাঁকে বেরিয়ে কিছু টাকা তুলে রেখেছিলাম। কিছু খরচ করেছি। এখনও আমার প্রায় হাজার দুয়েক টাকা আছে। কম

খরচ করে অনেক দিন ধরে জমিয়েছি। ইচ্ছা ছিল অনেক কিছু। সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। কেন, সেটাই বুঝতে পারি না।

এক সময় লনা দাঁড়িয়ে পড়ল। ডাকল; 'ছোটকা!'

বললাম, 'কিরে?'

—'চলনা কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি।'

—'বেড়াতে যাবি? কোথায়?'

—'যেখানে হোক। অনেক দূরে কোথাও। যাবে?'

বললাম, 'হঠাৎ বেড়াতে যাবার সখ হল কেন তোর?'

ও বলল, 'তুমিই তো বললে। ভাল লাগছে না?'

বুঝতে পারলাম সব। কষ্ট হল, তবু বললাম, 'আমি সে ভাল না লাগার কথা বলিনি।'

—'তবে?'

—'এই যে বসে আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি।' ওকে বোঝালাম, আমি, 'আমার আর ভাল লাগছে না। চাকরী গেছে। নতুন চাকরীও হয়তো পাবনা আর।'

—'তাহলে কি করবে?'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'ধর যদি ব্যবসা করি?'

—'দোকান করবে?'

—'মনে কর দোকানই করলাম।'

—'কিসের দোকান করবে?'

—'যদি জামা কাপড়ের দোকান করি?'

—'ঘর পাবে কোথায়। যদি ঘর পাও কত টাকা সেলামী দিতে হবে জান?'

—'কত টাকা?'

—'আমাদের স্কুলে একটা মেয়ে আছে। লছমী ভকৃত। ওর বাবার কাপড়ের দোকান আছে বড় বাজারে। ওর বড় বড় ভাইয়ের জন্যে ওখানেই একটা ঘর নিয়ে দোকান করে দিয়েছে। কাট পীসের দোকান। আশী হাজার টাকা সেলামী দিয়েছে।

—'বলিস কী?' চোখ কপালে তুললাম আমি।

—'তাইতো বলেছিল লছমী। দোকানটা একটা বাঙালী বুড়োর মেরামতীর দোকান ছিল।'

কথাটা অবিশ্বাস করতে পারলাম না। কদিন আগে দুপুরেই হঠাৎ ইচ্ছা হতে হাওড়ার ফুল দেখতে গিয়েছিলাম। অনেক দিন পরে যাওয়া। হ্যারিসন রোডের সেই চির পরিচিত ছবিটা কোথায় হারিয়ে গেছে। কাপড়ের দোকানের একচেটিয়া অধিকার যেন আজ অ-বাঙালীদের। আরো একটা জিনিস আমার লক্ষ্য পড়েছিল, মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলেছে-নামচ্ছে; একটা ছেলে দাঁড়ানো ট্যাক্সীগুলোর কাছে এঁকে-বেঁকে অনেক কসরত করে যাচ্ছে; পয়সা আদায় করছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। ষ্ট্যাণ্ড-রোডের দিকের মোড়ের বুড়ি ফলওয়ালীকে দৃশ্যটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কারণ। বুড়ি গুল খাওয়া কালো মাড়ি বার করে ফিক্ করে হেসে ফেলেছিল। তারপরই সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়েছিল। বলেছিল, 'ও কুছু লয়। হাপনি খান বাবুজি!'

বলেছিলাম, 'আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে।'

বুড়ি বলেছিল, 'হাপনি জানেন না?'

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, 'আমি এই প্রথম দেখছি।'

কথাটা শুনে বুড়ি আমার দিকে করুণার চোখে চেয়েছিল। তারপর ফিস ফিস করে বলেছিল, 'ওই ছোকরা পূজা আদায় করেছে।'

অবাক হয়ে বলে ছিলাম, 'পূজা—কিসের পূজা?'

—'ভগবান জী কো। ওই তো ভগবান খাড়া রয়েছে।'

কথাটা শুনে আর দাঁড়ায়নি। আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিলাম।

লনা বলল, 'কি ছোটকা, অত টাকা সেলামী দিতে পারবে?'

বললাম, 'আমি ঘর নিলে তো সেলামী দেব।'

—'তাহলে দোকান করবে কোথায়?'

—'কেন ফুটপাতে?'

—'কে দেবে তোমাকে ফুটপাত?'

বললাম, 'কে আবার দেবে। একটা জায়গা ঠিক করে বসে পড়ব এক দিন। ওইতো সব রয়েছে। কত খদ্দের দেখনা। ওদের মত আমিও দোকান দেব।'

—'তোমাকে যদি বসতে না দেয়?'

—'কেন বসতে দেবে না কেন?'

—'বলছি তো ব্যবস্থা না করলে দেবে না। আমাদের গলির মোড়ে বসলেও তোমাকে ব্যবস্থা বরতে হবে।'

—'কে বললে তোকে এ কথা?'

লনা গম্ভীর হল। বলল, 'আমি 'জানি। অনেক কিছুই জানি আমি। বাঙ্গালী না হয়ে অবাঙ্গালী হলেও না হয় একটা কথা ছিল। জায়গা পেতে, চাই কি বিক্রী করার মাল পত্রও ধারে পেতে। একটা পয়সা লাগতো না তোমার।

বললাম, 'পাকামী হচ্ছে?'

—'পাকামী আবার কি—যা সত্যি তাই বলছি। আজকের কগজটা দেখনি, এক বছরে যত রেশন দোকানের পারমীট দেওয়া হয়েছে তার পঁচানব্বই জনই অবাঙ্গালী এবং ধনী। অবশ্য বাঙালী বেকার যুবকদের ওগুলো দেবার কথা ছিল। কিন্তু ছোটকা শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভেজে, তুমিই বল? অবশ্য ভাগ্য ভাল হলে ফুটপাত পেতে পার—অবশ্যই উপযুক্ত দাদন দিতে হবে। আর দাদন নেবে কে? কেন অদৃশ্য হাত!

লনার কথাগুলো শুনতে বেশ ভালই লাগছিল। বেশ বলেও। আগে জানতাম না। কিন্তু ও যা বললে তা হয়তো সবটা ঠিক নয়। বাঙ্গালী হকারের সংখ্যা এ সহরে নেহাৎ কম নয়। যদিও যত দিন যাচ্ছে অবাঙালী হকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তির দিকে। এবং তাদের মহল্লায় বাঙালীর স্থান নেই।

চাকরীর সূত্রে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘোরবার আমার সুযোগ আমার হয়েছিল। দেখেছি কিছু কম নয়। একটা জিনিস বারবার নজরে পড়েছে অন্য প্রদেশ বাঙালীকে ঘৃণা করে। তাদের দেশের বাঙালীর মুখের ওপর গাল দেয়। এক দোকানের একই জিনিস স্থানীয় এবং বাঙালীর জন্যে আলাদা দর। প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। অবশ্য সহৃদয় মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

আবার এও দেখেছি, এই সহরে—কলকাতায়, বাঙালীকে-বাঙালী বলে গালি দেয় অবাঙালী যুবক। চোখ রাঙায়। অন্যায় করেও দাপটের সঙ্গে গলাবাজি করে।

নেতারা, মন্ত্রীরা চাকরীতে স্থানীয় লোক বঞ্চিত হচ্ছে বলে দুঃখ করেন। আইন করার কথা ভাবেন! কিন্তু কিছুই হয় না। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা

কিন্তু জিভ কাটেন। কথাটা শোনাও যেন তাঁদের মহাপাপ। কারণ তাঁরা নেতা। সব শ্রমিক তাঁদের ভাই—আত্মার আত্মীয়। ভাইয়েদের চাঁদার পয়সায় তাদের সংসার চলে। বুদ্ধিমান দাদারা একটু বেশি গুছিয়ে নেন। একটু গরমিল হলেই ধর্ম ঘটের ডাক ছাড়েন। অতএব তাঁদের ধোয়াতুলসী পাতার মত প্রাদেশিকতা দোষমুক্ত হয়ে থাকতেই হবে। নাহলে রুজি বন্ধ। ডান হাত মুখে উঠবে না। সমস্যা আলোচনার সময় মালিক পক্ষের সঙ্গে খানাপিনারও বরবাদ।

সারা রাজ্যে, এমনকি খাস ডালহৌসি পাড়ায় আগে অফিস গুলোতে স্থানীয় লোক চাকরী করতেন শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জন। এখন সেখানে অনেক অফিসে নয় দশ জন হবে কিনা সন্দেহ। বড় পোষ্টে বাঙালী অফিসারের দল নেই বললেই চলে। যাঁরা আছে তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই কোম্পানীর বেতনভুক কর্মচারী। অন্য প্রদেশীয় অফিসারদের মত জাতীয়তা বোধ (নিজের জাতি), মমত্ব, ভালবাসা নেই বললেই চলে। আত্মকেন্দ্রীয় (নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে), অহঙ্কারী, দাম্ভিক। বাঙালী পরিচয়টা যেন তাদের কাছে কলঙ্কের। গাড়ি, ফ্ল্যাট, স্ত্রী-পুত্র, ক্লাব। আর কি চাই! ব্রেকফাষ্ট-লাঞ্চ-ডিনার। ইংরাজী নভেল। ইংরাজী ছবির বদলে হিন্দী! কটা ব্যাঙ্কে পাশবই-লকার। ফ্রিজ-রেডিও গ্রাম (টেলিভিশন), রাতের বিছানায় সূক্ষ্ম ড্রেসিং গাউন পরা কালো রোগা ববছাঁটের চুলওয়ালা কোটি-পতি শ্বশুরের মেয়ে। অবশ্য ব্যতিক্রম বাঙালীও আছেন। মনে প্রাণে একজন বাঙালী।

আজ পশ্চিমবঙ্গে এরাজ্যের অধিবাসীদের চাকরী পাওয়া মুস্কিল। বস্ত্র শিল্পে ৫৮, পাটে ৭৯, ইস্পাতে ৬৪, ইঞ্জিনীয়ারিং এ ৪৭, কাগজ শিল্পে ৭৩ জন অবাঙ্গালী। বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। কে বিচার করছে! কিসের বিচার! সমবেদনায় পেট ভরে না। এবং বাঙ্গালীর একচেটিয়া রাজনীতির রঙ্গ মঞ্চেও নিশ্চয় একদিন সংখ্যা লঘুত্ব দেখা দেবে। শুধুমাত্র গরিষ্ঠতা থাকবে 'চুপা রুস্তমের' টিকিট ঘরে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বড় বড় শিল্প সংস্থার অনেকগুলোই যখন অবাঙালী মালিকানার হাতে গেল, তখন থেকেই শিল্প ব্যবসা থেকে বাঙালী বিতাড়িত হয়ে আসছে। সাহেবদের আমলে বড় শিল্পের সহযোগী যে সব ছোট ছোট শিল্প, কারখানা, অফিসগুলো ছিল তাতে বাঙালীর কাজের সুযোগ ছিল। কিন্তু

ভারতীয় হলেও অবাঙালীদের হাতে ওই সব সংস্থার মালিকানা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকরা দেশওয়ালী ভাইদের কাজের সুযোগ দিয়েছে। নিয়ম পালন করেছ অবাঙালী মালিকরা। কারণ তারা জানে আগে তারা যা-তাই তার পর ভারতীয়।

পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয়ের নীলভূমি। এখানে সকলের সমান অধিকার। বরং স্থানীয়দের অধিকার কিঞ্চিৎ মাত্রায় কম। কিন্তু স্বাধীনতার বলি বাঙালী উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের। কারণ দিল্লী অনেকদূর। দিল্লীর একপাশে পাঞ্জাব আর একপাশে বাঙ্গালা হলে পাঞ্জাবের মত বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার আর সমস্যা থাকতো না। কিন্তু বাংলা অনেক দূরে। বাঙালী রাজনীতিতেই ওস্তাদ। সভা শ্লোগান মিছিলের নামে এক পায়ে খাড়া। এদের কথা কে ভাবে?

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের সুযোহীন উদ্বাস্তুর সংখ্যা এখনও দশ লক্ষ। এছাড়া সাড়ে চৌদ্দহাজারের মত উদ্বাস্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গের আঠারোটা হোমে পচে মরছে। আরও দু'হাজার মানুষ গুটিয়ে ফেলা শিবিরের ওপর কোন রকমে আস্তানা গেড়ে বসে আছে। পুনর্বাসনের আশায়।

পূর্ব পাকিস্থান থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু এসেছে ৫৮ লক্ষের মত (সরকারী হিসাবে)। তার মধ্যে ২৩ লক্ষ উদ্বাস্তু মাত্র সরকারী সাহায্য পেয়েছে। আবার এই ২৩ লক্ষের মধ্যে ১২ লক্ষের কপালে সাহায্য মিলেছে ছিটে ফোঁটা। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন তাদের কাছে স্বপ্নই থেকে গেছে।

উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ দফতর ১৫০ কোটি টাকার মাসটার প্ল্যান তৈরি করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অসংখ্য বার দরবার করে এ প্ল্যান আজও অনুমোদন লাভ করেনি। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের টাকা আর হোম পরিচালনার জন্যে এক কোটি টাকা এতদিন ভারত সরকার দিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি তাঁরা সেটাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য: ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের রায় অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ অনেক টাকা পেয়েছেন। সুতরাং এখন উদ্বাস্তু ত্রাণ পুনর্বাসনের যাবতীয় দায় দায়িত্ব সবই রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রয় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের চিঠি পেয়ে রাজ্য সরকার বেকুফ। রাজ্যের ১৮টি উদ্বাস্তু হোমজুড়ে সাড়ে চৌদ্দ হাজার মানুষের চোখের জল দিল্লীর হুকুমকে নড়াতে পারেনি। এবং

হোমে যে উদ্বাস্তরা আছে তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনই অক্ষম, বৃদ্ধ না অনাথ হয় পঙ্গু। পুনর্বাসন নেবার ক্ষমতা পর্যন্ত এদের নেই। মাসে জনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা করে এরা সাহায্য পেত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। এদের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্যে যাদের মনোনীত করা হত তারা পরিবার পিছু ন'হাজার আটশো চল্লিশ টাকা পেত পুনর্বাসনের সাহায্যে। দু'হাজার আটশো চল্লিশ টাকা জমির জন্যে আর দু'হাজার টাকা গৃহনির্মাণ ঋণ। পাঁচহাজার টাকা দেওয়া হত ক্ষুদ্র শিল্প তৈরির ঋণের জন্য।

আঠারোটি হোম থেকে চার হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল —১৯৭৪-৭৫ সালে। এরা জমি পেয়েছে চব্বিশ পরগণা, হুগলী, নদীয়াতে। টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু এখন এ টাকা বন্ধ। রাজ্যের ক্ষমতা নেই গুরুদায় বহনের!

চৌষট্টিটা উদ্বাস্তু শিবির ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। এখন সব শিবির উঠে গেছে। কয়েক জায়গার উঠে যাওয়া পুরানো শিবিরের জমিতে এসে বসে পড়েছে কয়েক হাজার পরিবার। সংখ্যা দু'হাজারের মত। এরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন পেয়েছিল সেখানে না পোষাতে ফিরে এসেছে ছেড়ে যাওয়া শিবির গুলোতেই। এখন জবর দখলের ভূমিকায়। অবশ্য এদের আবার পুনর্বাসন দেওয়ার প্রকল্প ছিল। দু' হাজার টাকা করে বাড়ি তৈরির ঋণ পাচ্ছিল। যে জমিতে বসে আছে সেই জমি সরকার নিয়ে নিচ্ছিলেন এই ভাবেই ৭৪-৭৫ সালে ৭০০ পরিবার নতুন পুনর্বাসন পেয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়েছিল ভারত সরকার। সে টাকাও বন্ধ হয়ে গেছে।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি ভারত সরকার চিঠি দিল, পয়লা এপ্রিল থেকে তারা আর একটি পয়সাও নিতে পারবে না। মাত্র দেড় মাসের নোটিশে পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের ওপর বরাত চাপিয়ে একেবারে হাত ধুয়ে বসে পড়ল।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের খাতায় পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক-যারা ১৯৫৮ সালে এপ্রিলের আগে এসেছে। দুই-যারা ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ সালের মার্চের মধ্যে এসেছে। এই শেষোক্ত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ। এছাড়া ১৯৫৮ থেকে ৬৪ সালের মধ্যে আরও ৫২০০০ উদ্বাস্তু এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রচিত মাসটার প্ল্যানে স্বীকার করা হয়েছে ১৯৫৮ সালে পরে আসা উদ্বাস্তুরা

অধিকাংশই অধিকাংশই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা কিছুই পায়নি। এছাড়া সমগ্র উদ্বাস্তু জনসংখ্যার একটা বড় অংশই আজ অমানুষিক অবস্থার মধ্যে নিম্ন মানের জীবন যাপন করছে। এর জন্যে দায়ী বেকারী, অর্দ্ধ বেকারি, যে সব চাষী চাষের জমি পেয়েছে তার পরিমাণ এত কম।

এই জন্যে সমগ্র উদ্বাস্তু জন সংখ্যার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে ১৫০ কোটি টাকার একটা মাসটার প্লান রচনা করেছিলেন। রাজ্য সরকারের আশা ছিল কেন্দ্র এই টাকাটা দিয়ে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে। ৮২ পাতার ওই মাসটার প্লানে নানাবিধ কর্মসংস্থান প্রকল্পের খসড়া করে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রের শুভবুদ্ধি জাগানোর জন্যে পশ্চিমপাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা যে কেন্দ্রের কাছ থেকে পৃথক ব্যবহার পেয়েছে সেটাও উল্লেখ করা হয়েছিল।

যেমন বলা হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ১৯১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ পেয়েছে তাদের ফেলে আসা সম্পত্তির জন্যে। সেখানে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা একটি কানা কড়িও পায়নি। ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮৫ কোটি টাকা পুনর্বাসন বাবদ ব্যায় হয়েছে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে। আর পশ্চিম পাকিস্থানী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে ব্যায় হয়েছে ১১৫ কোটি টাকা।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে রাজ্য সভায় কংগ্রেস ও বিরোধী সদস্যরা এক যোগে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, পুনর্বাসনের ব্যাপারে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ওপর দারুণ অবিচার হয়েছে। বাঙালী উদ্বাস্তুরা ক্ষতিপূরণ পায়নি, পুনর্বাসন পায়নি অস্বাস্থ্যকর গ্লানিময় পরিবেশে তারা দিনের পর দিন বাস করছে, অথচ পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের চিত্র একেবারে বিপরীত। কেন এমন হল, এ নিয়ে খতিয়ে দেখার জন্য একটা কমিটি হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন ত্রাণ মন্ত্রী মাননীয় শ্রী আর. কে. খাদিলকর এ দাবী সরাসরি নাকচ করে দেন। রাজ্যের মাসটার প্লান কেন্দ্র গ্রহণ করে নি। সাহায্যও বন্ধ। এমন কি বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের কাছে আজ আন্দামান দণ্ডাকারণ্যের দরোজাও বন্ধ। দণ্ডাকারণ্যে আজ বন কেটে বসত বানাতে লোভ জনক শর্ত দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকজনকে নিয়ে আসা হচ্ছে। বন্ধ দরোজা খুলে দেওয়ার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাকুতি মিনতিতে কোন ফল হয়নি। কারণ কেন্দ্র শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সম্পদের ভাগিদার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঙ্কল্প করেছিলেন জবর দখল কলোনীর উদ্বাস্তুদের জমির ওপর স্বত্ব দেওয়া হবে। এই নীতি অনুসারে একলক্ষ আটচল্লিশ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে জমির মালিকানা দেবার কথা। তারা থাকে ৫১৮টা সরকারী ও ১৪৯টা জবর দখল কলোনীতে। ঠিক হয়েছিল প্রথম ৪০০ পরিবারকে, তারপর চার বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব উদ্বাস্তুকে মালিকানা দেওয়া হবে। কিন্তু এখন গোটা পরিকল্পনা অথৈ জলে। হয়তো কোনদিনই এর তল পাওয়া যাবে না।

—'ছোটকা, ও ছোটকা!'

লনার ডাকে সংবিত ফিরে পেলাম। ও আমাকে ডাকছে।

ও বলল, 'চলতে চলতে বিড়-বড় করে কি এত বকো বলতো? পথ চলতি লোক এমন ভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে যায়। লজ্জা করে বড়।'

বললাম, 'কেন লজ্জা করে কেন?'

—'করবে না-বারে। কি সব যাতা ভেবে বসে হয়তো তোমার সম্বন্ধে।'

—'ভাবলেই বা।' বললাম আমি!

—'না ভাববে না।' ওর জোরাল প্রতিবাদ। 'কেন ভাবুবে বল?'

হেসে ফেললাম। বললাম, 'আচ্ছা ক্ষ্যাপা মেয়েতো তুই। কে কি ভাবলো-কি না ভাবিল তাতে তোরই বা কি—আমারই বা কি? আর সত্যই কিছু ভাবলো কিনা কে জানে? ভাববরে সময় কোথায় মানুষের?'

—'তাহলে দু একজন যে বলে গেল কি সব?'

—'কি বলে গেল—কে?'

—'খুব বিশ্রী কথা। আমার শুনতে মোটেই ভাল লাগেনি।'

—'তাই বল। আবার হেসে ফেললাম আমি। 'ভাল কথা নয় বলেই তোর মনে লেগেছে। কিন্তু তুই বোধহয় জানিস না, খারাপ কথা বলতে ভাবনা চিন্তার দরকার হয় না। ভাল কথা বলার আগে ভাবতে হয়। ওরা সব না ভেবেই বলেছে। ওদের কথা শুনে মন খারাপ করতে নেই, বুঝলি!'

এবার লনা হেসে ফেলল। বলল, 'তুমি খুব চালাক ছোটকা।'

বললাম, 'কেন, চালাকিটা কি দেখলি তুই এর মধ্যে শুনি?'

লনা তবু আদুরে গলায় বলল, 'না তুমি খুব চালাক। কারো কিছু বলা

বলিতে তুমি মন খারাপ কর না! কিন্তু নিজের মনে কি বলছিলে তুমি বিড়-বিড় করে?'

বললাম, 'তাকি মনে আছে।'

—'সত্যি বলছো কিছু মনে নেই তোমার?'

—'সত্যি রে, এখন অনেক কিছু আমার মনে থাকে না—মনে করতে পারিনা।'

একটা অসহায় ধ্বনি আমার গলায়। লনা চুপ করে রইল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ফোর্ট পার হয়ে চলে এসেছি। বিকাল হয়েছে অনেকক্ষণ। গঙ্গার ধারে ধারে মানুষ। জলে জাহাজ। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। ছোট বেলায় মাঝে মাঝে দল বেঁধে আমরা জাহাজ দেখতে আসতাম। সন্ধ্যার পর আলো জলে ওঠা জাহাজগুলোকে বড় সুন্দর লাগতো দেখতে।

আজ আমি বসে থাকতে পারি। সারা রাত যদি আজ বাইরে কাটিয়ে যাই আমাকে কিছু বলার কেউ নেই। বলার নেই বললে হয়তো ভুল হল, আমাকে কিছু বলবে না। যদি দিনের পর দিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াই তাতেই কিছু এসে যাবে না কারো। আমার জন্যে কিছু আটকাবে না। শুধু একটা সংখ্যা বাড়বে ভব ঘুরেদের তালিকায়। ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা অনুসারে ভারতবর্ষের ভবঘুরে ও ভিক্ষুকের সংখ্যা ছিল ৭,৪৪,৫০০, সেখানে আমি আরো একজন হবো।

কিন্তু তা হবে না। লনার জন্যে আমাকে ফিরে যেতে হবে। হয়তো কথাটা ঠিক নয়। মাঝে মধ্যে একলাও তো বেরুচ্ছি ইদানীং। একদিন থেকে আর না ফিরলেও পারি। সেই ভরত রাজার হরিণ শিশুর মত। বনের পশু বনে চলে গেল, মানুষের ব্যথা বুঝল না। না, তা হয়না। সাহস পাই না। কোথায় যাব? আর ভবঘুরের এই সংখ্যাটাও মনে হয় ঠিক নয়। ওটা শুধু মাত্র হিসাবের হিসাব। ওটা ভিক্ষাবৃত্তিধারীদের সংখ্যা, ভিখারীর, সাধু ভাষায় ভিক্ষুকের সঠিক হিসাব নয়। হঠাৎ দেখে চমকে যাওয়া ভদ্রলোকের গায়ে গরদের পাঞ্জাবীর মত। পঞ্চাশ পার হয়ে বিয়ের সময়ের গরদের পাঞ্জাবী পরলে যেমন হয়। খোঁজ নিলে হয়তো দেখতে পাওয়া আশ্চর্য নয়, ওটাই ভদ্র সমাজে বার হবার শেষ অবলম্বন।

লনা বলল, 'একটু বসবে ছোটকা?'

অন্যমনস্ক ছিলাম, বললাম, 'বাদাম খেলে হয়।'

ছুটে গিয়ে লনা বাদাম নিয়ে এল। বাদাম নিয়ে বসলাম আমরা। গঙ্গায় ছু একখানা জাহাজ। একদিন কত থাকতো।

কদিন আগের একটা সংবাদ মনে পড়ল। সংবাদ দাতার কলমে : 'কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ আগামী আর্থিক বছরে (১৯৭৫-৭৬) সমস্ত শ্রেণীর জাহাজ ও মালের মাশুল শতকরা কুড়ি ভাগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি মেটানোর জন্যেই এই সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে খরচ কমানোর জন্যে কয়েকটা বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে (একশো পাঁচ বছরের পুরানো কলকাতা বন্দরকে গুটিয়ে দেওয়ার কাজ ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে সব কটা জেটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। চারশো কিলোমিটার লম্বা বন্দরের রেলপথের মূল লাইন ছাড়া শাখা প্রশাখা সব বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বন্দরের নিজস্ব আটত্রিশ হাজার কর্মীর পঁচিশ শতাংশকে স্বেচ্ছা অবসর নিতে বলা হবে। এবং কলকাতাকে বাঁচানোর জন্যেই গোটানোর কাজ স্বরু হবে।

১৮৭০ সালের বর্তমান পোরট ট্রাসট পোরট কমিশনার নামে গুটি কয়েক জেটি নিয়ে কাজ স্বরু করে। বর্তমানে ছুটো ডক-নটা জেটি। এবং বর্তমানে অধিকাংশ জেটি অবব্যবহার্য। সারা বছরে নটার মধ্যে মাত্র ছুটো কাজে লাগে। তাও বড় জোর পাঁচ থেকে ছ'মাস। অধিকাশ জেটিরই শেষ অবস্থা। ১৯৭০ সালের হিসেব অনুযায়ী সবকটা জেটিকে সরিয়ে তুলতে তিন কোটি টাকার দরকার। অবশ্য বর্তমান মূল্য মানে পাঁচ থেকে ছকোটি টাকা।"

পোরট ট্রাসটের টাকা নেই। ১৯৭৪ সালে লোকসান আট কোটি টাকা। গত দশ বছরে লোকসানের পরিমাণ তিরিশ কোটির কিছু বেশি। জেটিগুলো চালু রাখতে বছরে খরচ ছু কোটি টাকা। তুলে দিলে টাকা এবং লোক বল ডক ব্যবস্থার উন্নতিতে লাগানো যাবে। এবং হলদিয়া-ফরাক্কা কলকাতাকে বাঁচানোর শেষ ছুটো খুঁটি।

স্বাধীনতা ইস্তক গত আড়াই যুগে দেশের অন্যান্য বন্দর যখন রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির সুযোগে নিজেদের উন্নতির পথ সুগম করতে পেরেছে, কলকাতা তখন ক্রমশঃ পিছন দিকে এগিয়েছে।

কলকাতায় বছরে এককোটি কুড়ি লাখ টন মাল আনা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে সত্তর লাখ টনের বেশি মাল আমদানি-রফতানি হচ্ছে না। এফ, সি, আই, এম, এম, টি, সি, প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা কথা দিয়েও কলকাতা মারফত মাল আমদানি-রফতানি করছে না। ফলে শুধু যে বন্দর ক্ষতিগ্রস্থ

হয়েছে তাই নয়, গত দশবছরে নতুন কোন চাকরী পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। অথচ সারা ভারতে কলকাতার মত সব দিক থেকে সুযোগ সুবিধে সম্পন্ন বন্দর দ্বিতীয়টি নেই। কর্তৃপক্ষের ধারণা শুধু মাশুল বাড়িয়েই সাতকোটি টাকার মত উশুল হবে। জাহাজি কোম্পানিগুলো অসুখী অসুখী বণিক সভার প্রতিনিধিরাও।

গতবছর কলকাতা বন্দরের ঘাটতি আট কোটি টাকা। এ বছর ষোল কোটি টাকা হতে পারে। কলকাতার এই বিপুল লোকসানের জন্যে দায়ী মিনা রেলস অ্যানড মেটাল ট্রেডিং করপোরেশন, ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া ইত্যাদি কয়েকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। ডিরেকটর জেনারেল অব শিপিং ও কলকাতার গুরুত্ব হ্রাসে সদা তৎপর। সায় আছে দিল্লীর।

১৯৬৪-৬৫ সালে এই বন্দর মারফত এককোটি দশলক্ষ টন। ১৯৭৩-৭৪ সালের হিসাব তেষট্টি লক্ষ টন। ১৯৭৪-৭৫-এ ষাট লক্ষ টন হবে কিনা সন্দেহ।

কলকাতা বন্দরের আয়ের পথ মাত্র তিনটি—(১) জাহাজ ভাড়া (২) মালের ভাড়া (৩) নিজস্ব জমির লিজের আয়। এর মধ্যে জাহাজ ও মালের ভাড়া থেকেই বন্দরের সংসার চলে। কিন্তু গত কয়েক বছরে বন্দরের আমদানি—রফতানি নিপুনভাবে কমানো হয়েছে। মালের বোঝা যত কমছে—জাহাজ কমছে ততোই।

বছর কয়েক আগেও কলকাতাই সারা দেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ খনিজ লোহা, খাদ্য শস্য, কয়লা আনা নেওয়া করেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে কলকাতা থেকে ৯ লক্ষ টন খনিজ লোহা বিদেশে চালান গিয়েছে। গত বছরের পরিমাণ ২ লক্ষ টন। চলতি বছরে এক লক্ষ টন হবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এক ছটাক লোহা রপ্তানি কলকাতা বন্দরের ভাগ্যে জোটেনি।

খনিজ লোহা বিদেশে রপ্তানি করার মালিক কেন্দ্রীয় সংস্থা মিনার লেন অ্যাণ্ড মেটাল ট্রেডিং করপোরেশন। সংস্থাটি জন্মাবার পর থেকেই কলকাতার ওপর বিরূপ। যখনই কলকাতা অনুরোধ জানিয়েছে, ততোবারই সংস্থান জানিয়েছে, জাপানী ব্যবসায়ীরা নাকি চান একই জাহাজে বেশি লোহা আমদানী করতে। আর কলকাতায় বড় জাহাজে ভেড়ে না। তাই সব চালান কারবারের সুযোগ এখন পাচ্ছে পারাদ্বীপ ও বিশাখাপত্তনম্ বন্দর (অবশ্যই নেপথ্য নাটক অপ্রকাশ্য)।

ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়াও কলকাতার ওপর বিরূপ। মাত্র ছমাস

আগে দিল্লীতে (২০।২।৭৫ থেকে) এক বৈঠকে এফ. সি. আই কর্তৃপক্ষ কলকতাকে বলেন, প্রস্তুত থাকুন, কম করেও বছরে দেড় লক্ষ থেকে এক লক্ষ ষাট হাজার টন খাদ্য শস্য এইবন্দর মারফত আমদানি করা হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বাঁচার জন্যে ব্যবস্থা নেন। কিন্তু দেড়লক্ষ টন তো দূরের কথা এক লক্ষ খাদ্য শস্যও কলকাতায় ভিড়বে না। অথচ গত বছর পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টন খাদ্য শস্য এই বন্দর মারফত দেশে আমদানি হয়।

আর পূর্বাঞ্চলের খাদ্য চাহিদা যেখানে কলকাতা বন্দর মারফত মেটানোর কথা, সেখানে এফ. সি. আই বর্তমানে সুদূর কাণ্ডালা বন্দরে খাদ্যবাহী জাহাজ ভেড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। সেখান থেকে মোটা টাকার লরি বা রেলভাড়া কবুল করে পাটনা, কলকাতা, গৌহাটি আর ভুবনেশ্বরের খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্য আনা হচ্ছে। আর সেই বাড়তি ভাড়ার দায় চাপছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে—খাদ্য শস্যের দাম বাড়িয়ে আর রেশনে দাম বাড়ার কল্যানে খোলা বাজারেও দাম বাড়ছে (কালোবাজারী কারবার ফলাও হচ্ছে দিন দিন। শুধু মাত্র প্রশানন যন্ত্রের তুলনাহীন যোগ্য তার জন্যেই সাধারণ মানুষ পিছন দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। এই হতভাগার দলই দেশটাকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিয়েছে। ভাগ্য এদের সহায়। অযোগ্যতা আর হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা আর ব্যাভিচার এদের মজ্জায় মজ্জায়। অবশ্যই এরা দেশ-প্রেমিক কিন্তু মানুষকে ভালবাসেনা। মোটা মাইনে আর ঘুষের বাইরে এরা। কিছু বোঝে না, জানে না, বুঝতে চায় না। এই আমলা চক্র ব্যবসাদার আর মুনাফা খোরের দলই স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রকৃত জনগণ। পাঁচ বছরের প্রতিনিধিরা এদের হাতের খেলার পুতুল। তাদের কিছু করার ইচ্ছা থাকিলেও এদের চক্রের বিরুদ্ধে কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর প্রকৃত সৎ উদার দেশ প্রেমিক যাঁরা আছেন তাঁরা নীরব থাকতে বাধ্য হন। তাঁরা কাজ করতে চাইলেও তাদের তা করতে দেওয়া হয় না। কারণ তাঁরা চক্রহীন। চক্রের বাইরে একলা লড়ার সাধ্য তাদের কতটুক! দল না তৈরি করলে খারাপ কাজ যেমন করা যায় না, ভাল কাজও—তবেই তাঁরা পারবেন দেশ এবং দশের জন্যে প্রকৃত কাজ করতে)।

কয়লার ব্যাপারে বঞ্চনার বহর সব চেয়ে ব্যাপক। ১৯৬২-৬৩ সালে কলকাতা মারফৎ কুড়িলক্ষ টন কয়লা বিদেশে (ব্রহ্মদেশ ও বর্তমানে বাংলা দেশ) ও দেশের (মাদ্রাজ, তুতি কোরিন এবং গুজরাটের কয়েকটি বন্দর) বিভিন্ন

প্রান্তে চালান যায়। গত বছর কয়লার দেশ পশ্চিমবঙ্গের বন্দর মারফত চালান গিয়েছে সাত লক্ষ কুড়ি হাজার টন কয়লা।

এক বছর আগেও দিল্লী কলকাতা বন্দরকে জানিয়েছিল চলতি আর্থিক বছরে এই বন্দর মারফত কুড়ি লক্ষ টন কয়লা চালান দেওয়া হবে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কয়লাহীন অঞ্চলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির প্রয়োজন মেটানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তের মূলে পেটরোল সংকট। দিল্লী আরও বলেছিল, তিন চার বছরের মধ্যে এই চালানের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাদ কয়লা রপ্তানীর পরিমাণ কলকাতা মারফৎ হবে ৬৫ লক্ষ টন।

কিন্তু ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ (১৯৭৫) পর্যন্ত যা চালান হয়েছে তাতে বারো লক্ষ টনের বেশি হবার কোন আশাই নেই। আবার কয়লা চালান কম হওয়ার মূলে কেন্দ্রীয় সরকার। ডিরেকটর জেনারেল অব শিপিং-কে বারবার বলা সত্ত্বেও গুজরাটের লবণবাহী জাহাজগুলিকে কখনোই পরিকল্পনা মাফিক সারা বছর ধরে ছড়িয়ে কলকাতায় আনা যায়নি। এই জাহাজগুলি কলকাতায় লবণ নামিয়ে দিয়ে কয়লা নিয়ে যায়। কলকাতা থেকে কয়লা চালানের শতকরা ষাটভাগই বহন করে এই জাহাজগুলি। এরা নিজেদের সুবিধামত জোয়ারের সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে কলকাতায় আসে। বন্দরের কোন রুটিন এরা মানতে নারাজ।

তাছাড়া লবণ ব্যবসায়ীরাও ব্যবসায়িক স্বার্থে বন্দরে ভেড়নো জাহাজগুলি চটপট খালাস করতে রাজী নয় (অবশ্য রাজী না হওয়াই স্বাভাবিক। কিছুদিন আগের দু'আনায় পাঁচপোর লবণ আজ চল্লিশ পয়সা কেজি ; কোথাও পঞ্চাশ, ষাট। বাজারে একটু টান ধরাতে পারলেই দুর্ভিক্ষের আর্তনাদ পড়ে যায় মাঝেমধ্যে। ফুটপাতেও পসরা সাজায় হঠাৎ গজিয়েওঠা দোকানদার। কিলো একটাকা-দেড় টাকা, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার ফালতু মুনাফা। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গেও লবণ তৈরির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'সাগর দ্বীপ' প্রশস্ত ক্ষেত্র। যথেষ্ট লবণাক্ত সমুদ্রের জল। লবণ তৈরিও করে সেখানকার মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটু উদ্যোগী হলেই সম্ভব। মেটে অন্তত সেখানকার বেকার সমস্যাও, যেখানের মানুষ সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমেও ক্ষুধার অন্ন জোটাতে পারে না। অর্থ ? গাঁটের কড়ি যাবে না সরকারের। শুধু চাই একটু উদ্যোগ। পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয় এখানে। এমন সুন্দর সরকারী ব্যবস্থা খুব কম তীর্থক্ষেত্রে দেখা

যায়। কঠোর সরকারী নির্দেশ মানতে হয় সমস্ত ব্যবসাদারকে। বেশি মুনাফা লোটার সম্ভাবনা বড় কম।. যে তীর্থযাত্রীদের অত সুযোগ সুবিধে দিচ্ছে সরকার তারা কেন মাথা পিছু দক্ষিণা গুণবেন না? সেই টাকাতেই উন্নতি হবে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে জমজমাট দ্বীপটার। সামান্য হলেও কিছু বেকারের সমস্যার সমাধান হবে। সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই, সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা, বস্তুবাদী পুরুষ, অতীতের সেই অসম্ভবকে সম্ভব-করে-তোলা মহর্ষি কপিলের স্বপ্নের কিছুটা সার্থক হবে নিশ্চয়ই। কারণ তিনি তাঁর সাধনার দ্বারা মানুষের কল্যাণ করে গিয়েছিলেন)। দেশী নৌকার দলও রাতে কাজ করে না। ফলে কাজ চলে ঢিমে তালে। হলদিয়া চালু হলেও এসব সমস্যার সমাধান হবে কি?

—'ছোটকা বাড়ি যাবে?'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জলে কটা মাত্র জাহাজ। আলো জলছে। কিন্তু এ বন্দরের গভীরে নিদারুণ অন্ধকার। লনার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আর একটু বসি লনা।'

লনাও যেন তাই চেয়েছিল। আরামে পা দুটো ছড়িয়ে দিল ও।

চায়ের কাপে ছোট একটা চুমুক দিয়ে প্রশান্ত বলল, 'তারপর তোর খবর বল। তোর সেই ফিয়াঁসে, কি যেন নাম, তার কি খবর? বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছিস না কেটে গেছে? চাকরী করছিস কোথায় যেন, হ্যাঁ, ভাল কথা —আমাদের সেই লাটু এখন ফরেনে, কানাডায় স্থায়ী বাসিন্দা। কিরে চুপ করে রইলি কেন, বল সব!'

প্রশান্ত সরকার। আমার কলেজের বন্ধু। একসঙ্গে তিনটে বছর কাটিয়েছি আমরা। হুল্লোড়বাজ ছেলে বলে নাম ছিল। বেশ সুন্দর ভাবে পেছনে লাগতে পারতো প্রায় সকলেরই আমাকে আর বাণীকে শুধু বাদ দিয়েছিল জানি না কোন অজ্ঞাত কারণে। প্রশান্ত কিন্তু ছাত্র ভাল ছিল। আমি কলেজ ছেড়ে চাকরীতে ঢুকেছি। ও ইংলিশে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। থিসিস লিখে ডক্টরেট পেয়েছে। এখন ওর নামের আগে লিখতে পারে ডঃ প্রশান্ত সরকার। কিন্তু লেখার উপায় নেই। কি হবে লিখে। লজ্জা বাড়বে। সাধারণ একটা হোটেল কর্মচারীর কি ওসব শোভা পায়!

প্রকৃত অবস্থাটা চেপে গিয়ে বললাম, আমার সব এক রকম, গতানুগতিক। তোর গল্প বল।'

—'গল্প! কিসের গল্প শুনবি, আমার জীবনের?'

—'তোর হোটেলের গল্প। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হচ্ছে তোর।'

—'তা হচ্ছে। তিক্ত এবং মধুর। এখনকার মডার্ন রাজ-রাজড়া-পাত্র-মিত্র সভাসদ নিয়ে কারবার। মন্দ কাটে না দিনগুলো।'

—'তাহলে বল ভালই আছিস?'

—'খারাপ থাকার উপায় কোথায়? চাকরীর খাতিরে ভাল থাকতেই হয়। কানে শুনতে হয় অনেক কিছু। চোখেও দেখতে হয়।'

—'কি দেখিস?'

—'প্রকাশ করা নিষেধ।'

—'বলিস কি?'

হেসে ফেলে প্রশান্ত। বলল, 'নাইবা শুনলি সে সব। শুধু একটা কথা শোন, এক শ্রেণীর মানুষ, যাদের টাকার প্রতি কোন মমতা নেই তাদের দেখি আর তাজ্জব হই। অবশ্যই কিছু ভাবি না।'

—'কেন?'

—'হতভাগাগুলোর কথা ভেবে এনার্জি নষ্ট করে লাভ কি বল। কোথায় দিল্লী-মাদ্রাজ-বম্বে। প্লেনের রিটার্ন টিকিট কেটে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে হোটেলে এসে উঠছে, শুধু মাত্র একটু ফুর্তি করে যাবার জন্যে—একথা চিন্তা করতে পারিস?'

—'বলিস কি?'

—'হ্যাঁ ব্রাদার, এটাই সত্যি। ছোকরার হাতে এটাচি। দেখেই বুঝতে পারি পরিচয়। যে কোন ভাড়ায় একটা ঘর। দালালরা সক্রিয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ পল্লীর কুড়ি পঁচিশ টাকার মেয়েরাই আড়াইশো টাকায় চলে আসে। রঙে ঢঙে আরো কিছু আদায় করে নিয়ে চলে যায়। অপেক্ষমান ট্যাক্সি বা মোটরে প্লেন ধরতে ছোটে ছোকরা সাহেব। এটাচির টাকা হয়তো সামান্যই খরচ হয়। এসেছিল বাঙালী কলেজ গার্লদের সঙ্গ সুখ লাভ করতে। ফিরে গিয়ে বসতে হবে বাপের তৈরী অফিসের ম্যানেজারের চেম্বারে। অতএব সময় বড় কম। টাকার বিনিময়ে যা পাওয়া গেল তাই বা কি কম!

—'এসব সত্যি?'

—'মিথ্যে হবে কেন?'

—'এ যে জটিল ধাঁধা!'

—'উত্তর তো দুর্লভ নয়। ধাঁধাঁ যখন উত্তর মিলবেই।'

—'কিন্তু অত টাকা ওই ফুর্তিবাজের দল পায় কোথায়?'

—'যাদের আছে তারা পাবে না কেন?'

—'কিন্তু ওই বিপুল টাকা?'

—'ওটাই তো সত্যিকারের ধাঁধাঁরে। পায় কোথায়? আমিও আমার চাকরী জীবনের প্রথম প্রথম তোর মতই ভাবতাম। ভেবে ভেবে হেদিয়ে মরতাম। তারপর একটু একটু করে বুঝলাম, জানলাম, দেখে দেখে চিনলাম। একাউণ্টসের কর্মী কিন্তু কাজ করতে হয় সর্বত্রই প্রায়। দু'বছর তিন মাসের হোটেল, চাকরির বয়েস পাকা দু'বছর। রাত দশটার সিপটে ডিউটি। মুর্তিমান এলেন প্রায় বারোটায়। পাকা পাঁচ ঘণ্টা প্লেন লেট। ঘর চাই। নেই। সুরু হয় শালার ছেলের কাকুতি মিনতি। বুঝি সব—দর বাড়াই শুধু—ঘর দিই। যথারীতি বাকি বন্দোবস্ত ছোকরাই করে নেয়। ভোর সাড়ে পাঁচটায় প্লেন। যাবার সময় পকেটের দামী কলম, কখনো খরচ না হওয়া বিলিতি সেণ্টের শিশি উপহার হিসাবে দিয়ে যায়। কলকাতার জরুরী কাজ সেরে বাপের সুপুত্তুর সোমবার ভোরে ছোটে বাপের ব্যবসা সামলাতে। সঙ্গে নিয়ে আসা টাকাগুলো উড়িয়ে যেতে পারল না বলে মনে নিশ্চয়ই দুঃখ থাকে! আর সেই জন্যেই রাতজাগা চোখে আবার আসবার নিমন্ত্রণ জানাতে হয়।'

প্রশান্ত চুপ করল। আমিও চুপ করে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে কি ভাবছিস?'

বললাম, 'কিছুই ভাবছি না।'

—'তাহলে?'

—'ভাবছি কি ভাবা যায়।'

হাসল প্রশান্ত। বলল, 'ভাবতে যাসনি, মন খারাপ হয়ে যাবে। বলা যায় না মাথার গোলমালও দেখা দিতে পারে। তার চেয়ে না ভাবাই ভাল।'

উঠে পড়লাম আমরা। পরে দেখা হবে কথা দিয়ে বিদায় নিলাম দুজনে। কিন্তু প্রশান্তর বলা কথাগুলো অনেক চেষ্টাতেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। বার বার ঘুরে ফিরে একই কথা মনে পড়তে লাগলো। অজস্র টাকা। মনে পড়ল···

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতে পরিকল্পনায় বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের পরিমাণ কিভাবে বাড়াতে পারা যায় এবং জাতীয় কর ব্যবস্থায় কিভাবে পরিবর্তন আনলে পরিকল্পনায় বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ বাড়তে পারে তার অনুসন্ধানের জন্য প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডরকে ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ঐ আমন্ত্রণে অধ্যাপক ক্যালডর এদেশের কর-ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছিলেন ১৯৫৬ সালে। ভারতবর্ষের ট্যাক্স ব্যবস্থার হালচাল দেখে অধ্যাপক বলেন, দেশে জাতীয় আয় বাড়ছে কিন্তু সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়কর ও অন্যান্য কর বাবদ সরকারের আয় বাড়ছে না।

লক্ষ্য করে দেখা গেছে ১৯৫৬ সালের আগের পাঁচ বছর ধরেই কর বাবদ সরকারী আয় প্রায় নির্দিষ্ট থেকে গেছে। জাতীয় আয়ের সাত শতাংশ প্রায় নির্দিষ্ট ছিল কর বাবদ সরকারী আয়। অধ্যাপক ক্যালডরের মতে এই তথ্য থেকেই ধরা যায় কর ফাঁকি দেওয়ার এক বিস্তৃত ক্ষেত্র ভারতীয় ব্যবস্থায় তৈরি আছে।

ক্যালডর বলেন,……There is a considerable amount of erasion in India due to fraudulent concealment of income."

তিনি আরো বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা দেশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। …তিনি নতুন কয়েকটি কর স্থাপনের প্রস্তাব আনলেন, যাতে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর ফাঁকি দেওয়ার কিছু কিছু রাস্তা বন্ধ হতে পারে এবং সরকারের আয়বৃদ্ধিও ঘটতে পারে।

দেখা গেল ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে কয়েক বছরে ক্যালডরের প্রদর্শিত পথে কর ব্যবস্থায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কর বাবদ মোট আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ ব্যবস্থায় লুকানো আয়ের কিছু অংশের ওপর কর নির্ধারিত হয়ে সরকারী ভাণ্ডারে জমা পড়তে সুরু করল।

১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয় বেড়েছে ৯০ শতাংশ আর মোট কর বাবদ আদায় জাতীয় আয়ের প্রায় ৮ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট কর বাবদ আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশিত উন্নতি দেখানা গেলেও একটা ধারাবাহিক উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কিন্তু বর্ধিত আয় থেকে কর ফাঁকি দেওয়ার অন্য বহু রকম ব্যবস্থা ইতিমধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে পর পর সাত বছরে যে সামান্য

বৃদ্ধির হার বজায় ছিল তাও নষ্ট হয়েছে, ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে জাতীয় আয় ১৯৬৫৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০-৭১ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৯৫৬৭ কোটি টাকায়। সাত বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে একশো শতাংশ কিন্তু কর বাবদ সরকারী আয় জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যেই রয়ে গেল। মোট কর বাবদ আয় জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশের গণ্ডী পেরোতে পারল না—১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রইলো। যেমন:

সাল	মোট কর (কোটি টাকায়)	জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে মোট কর (%)
১৯৫১-৫২	৭০৯	৯৮৫৭	৭·৭
৫২-৫৩	৭১৩	১০৫৩২	৭·২
৫৩-৫৪	৭৬০	৯৭৯৮	৬·৮
৫৪-৫৫	৮১৩	১০৩৪২	৭·৮
৫৫-৫৬	৯৩৯	১১৭৩০	৭·৯
৫৬-৫৭	১১১২	১১৯৮২	৮·০
৫৭-৫৮	১১৫৩	১৩৩৪৩	৯·৩
৫৮-৫৯	১২৮৫	১৩৮০৬	৮·৬
৫৯-৬০	১৪৬০	১৪৯৭৬	৯·৬
৬০-৬১	১৬৫৭	১৫৯৪০	৯·৭
৬১-৬২	১৯৮২	১৭০৬৭	১০·৪
৬২-৬৩	২৪২১	১৯৬৫৪	১১·৬
৬৩-৬৪	২৬৯৪	২২৯৬০	২২·৩
৬৪-৬৫	৩০৪৮	২৩৯২১	১১·৭
৬৫-৬৬	৩৪২৬	২৭৪৬৭	১২·৭
৬৬-৬৭	৩৬৩৮	৩২৩১৩	১২·৫
৬৭-৬৮	৩৯২৩	৩৩০০৬	১২·৯
৬৮-৬৯	৪৩৯৬	৩৪৯০০	১২·৯
৬৯-৭০	৪৯৫৩	৩৯৫৬৭	১২·৬
৭০-৭১	৫৭৯৪	৪২১৬৩	১২·৫

জাতীয় আয় যে হারে বেড়েছে, ট্যাক্স বাবদ আয় প্রত্যাশিত হারে বাড়েনি। কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বহু রাস্তা খুলে গেছে এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে কর ফাঁকি দেওয়া ও কালো টাকার বৃদ্ধি কি হারে বেড়ে চলেছে ভাবলে আতঙ্কিত হতে হয়। কারণ ১৯৫১ সাল থেকে

১৯৭১ সাল পর্যন্ত দেশের শতকরা ৪০ শতাংশ মানুষের আয় দারিদ্র্য সীমারেখার নীচেই রয়ে গেছে (অবশ্যই এ অবস্থার কিছু মাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।…এবং এটি সরকারের দেওয়া তথ্য)। জাতীয় আয় বাড়লে দেশের বিস্তৃত জন গোষ্ঠীর আয় বাড়েনি,—তাহলে দেশের বর্ধিত আয় কোথায় গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে ?

বোঝাই যাচ্ছে ক্রমবর্ধিত জাতীয় আয়ের বৃহদংশ দেশের উচ্চতম আয়ের মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে এবং যে পরিমাণে উচ্চতম আয়ের মানুষদের সম্পদ ও আয়বৃদ্ধি ঘটে চলেছে সেই আয়জাত প্রত্যাশিত কর সরকারী ভাণ্ডারে জমা পড়ছে না।

১৯৫৬ সালেই অধ্যাপক ক্যালডর দেখিয়েছিলেন যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শতকরা ৪০ ভাগ প্রাপ্য কর সরকারী তহবিলে জমা পড়ছে না আর ৭৫ শতাংশ কর জমা পড়ে না স্বাধীন বৃত্তিধারী মানুষের আয় থেকে ও সম্পত্তিজাত আয় থেকে।

অধ্যাপক ক্যালডরের হিসাব মত তাঁর সমীক্ষার সময়সীমার কয়েক বছরে বার্ষিক কর ফাঁকির পরিমাণ ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা। অবশ্য অধ্যাপক ক্যালডরের এই তথ্য পেশ করার কিছু আগে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কোন এক অদৃশ্য কারণে এই কর ফাঁকির পরিমাণ আরো কম করে দেখিয়েছিল।

১৯৫৬-৫৭ সালে অর্থ মন্ত্রীর বাজেটে বলা হয়েছিল, কর ফাঁকির পরিমাণ বছরে কুড়ি থেকে তিরিশ কোটি টাকা মাত্র। অধ্যাপকের ধাক্কায় অর্থমন্ত্রণালয়ের সঠিক হিসাব ভীষণ ভাবে মার খায়। তাঁর নির্দেশ মত কর ব্যবস্থায় আদায়ের কিছুটা উন্নতি হয়। যেমন—

বার্ষিক মোট

বছর	নির্ধারিত কর (কোটি টাকায়)	বার্ষিক বৃদ্ধি (কোটি টাকায়)
১৯৫৭-৫৮	১১১২	…
১৯৫৮-৫৯	১১৫৩	৪১
১৯৫৯-৬০	১১৮৫	১৩২
১৯৬০-৬১	১৪৬০	১৭৫
১৯৬১-৬২	১৬৫৭	১৯৭
১৯৬২-৬৩	১৯৮২	৩২৫
১৯৬৩-৬৪	২০২১	৪৩৯

ধার্য করের ক্রমবর্ধিত হার লক্ষণীয়। কিন্তু এই উন্নতিও কর বাদ প্রত্যাশিত আয় থেকে অনেক কম এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, অধ্যাপক ক্যালডরের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা না নিলে এই উন্নতি সম্ভব হত না। কারণ আমাদের সরকারীযন্ত্রের মুরুব্বিআনায় যে ভ্রান্ত হিসেব, সেই মত ব্যবস্থাদি নিলে দেশ এখন যে সংকটে পড়েছে আরো আগেই এই সংকট এসে পড়ত।

এই যে কর বাবদ বর্ধিত আয় এতটাও সরকার সম্ভবত আশা করেনি (মনে হয় এই সরকার চায় না যে, একাংশের বর্ধিত আয়ের ওপর এরকম করের চাপ পড়ুক। কেননা মোট প্রাপ্য করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট অংশ কর হিসাবে জমা পড়েছে। এর শতকরা পরিমাণ ১৯৬৪ সালের পর থেকে বারো শতাংশের সামান্য ওপরে এসে স্থির হয়ে রয়েছে)।

এমনকি মহাবীর ত্যাগীকে চেয়ারম্যান করে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার অনুসন্ধানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের যে শাখা কমিটি তৈরি হয়েছিল, ১৯৬৮ সালে তার রিপোর্টেও অধ্যাপক ক্যালডরের হিসেব যে বেশি করে ধরা হয়েছে, তা বলতেও ওই কমিটির বাধেনি।

কিন্তু ট্যাক্স ব্যবস্থায় একটা জিনিস বরাবর দেখা গেছে যে, যতই কম করে করের হার ধরা হোক না কেন, কর ফাঁকি দেওয়া যেমন বর্ধিত হারে চলেছে তেমনি দেয় কর বাকি রাখা এবং সেই কর উদ্ধার করা সরকারের কাছে এক প্রচণ্ড সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে। আবার সরকারী ব্যবস্থায় প্রতি বছর কর অ্যাসেসমেন্ট কি পরিমাণে বাকী থাকে সেটাও দেখার মত। যেমন :

বছর	বছরকালীন আয়কর হিসাবের সংখ্যা	অসম্পূর্ণ আয়কর হিসাব	শতকরা কি পরিমাণ হিসাব বছরে অসম্পূর্ণ থাকে
১৯৫৯-৬০	১৬৭২০০১	৫০৮৭৭৭	৩০.৪
১৯৬০-৬১	১৮২৬০১২	৬১৯১১৭	৩৩.৯
১৯৬১-৬২	২০২১৩৩০	৭১২৪৩৭	৩৫.২
১৯৬২-৬৩	২২১৮৩৭৬	৯০৮৬৫৯	৭০.৬
১৯৬৩-৬৪	২৭০৯১০৭	১২২৬৪০৬	৪৫.৩
১৯৬৪-৬৫	৩৬২৬১৪৪	১৭৮৪৫১৫	৪৯.২
১৯৬৫-৬৬	৪৫৫৮৫৫৬	২১৬৯৫২৯	৪৭.৬
১৯৬৬-৬৭	৪৭৬৪৫৯৭	২৩৪৬৫৩১	৪৯.৫

অ্যাসেসমেণ্ট বাকি থাকা বাড়তে থাকে ১৯৩৯ সাল থেকেই। ইংরেজ সরকার দেশ ছেড়ে চলে গেল। জাতীয় সরকার শাসনভার নিল দেশের কিন্তু সুরাহা কিছুই হল না। বরং দিন দিন বাড়তে লাগল সমস্যা এবং দরকার মত সরকার পরোক্ষ কর বাড়িয়ে আপামর জনসাধারণের ওপর চাপ দিয়ে সরকারী আয় বাড়িয়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু আয়কর বিভাগকে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে কর আদায়ের পরিমাণও বাড়েনি।

এটাও নিশ্চিত যে, যেসব প্রাপ্য কর সময়মত আদায় হয়নি, সে সবের বিরাট অংশ অতি উচ্চতম আয়ের মানুষদের থেকেই প্রাপ্য। অনাদায়ীকৃত কর সম্পদরূপে ব্যক্তিগত পুঁজি হিসাবে নিয়োজিত হয়ে যে পরিমাণ সোনার ডিম পাড়ে তা নিঃসন্দেহেই কালো টাকার বৃদ্ধি করে।

অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৫৯-৬০ সালে একজন ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার গড়ে বছরে ৯৩৯টি ব্যক্তিগত করের হিসাব রেখেছেন—এর পরে প্রতি বছরে হিসাবের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ১৯৬৬-৬৭ সালে একজন ইনকামট্যাক্স অফিসারের ঘাড়ে চেপেছে বছরে ১৪৬৭টি ব্যক্তিগত করের হিসাব। যে কোন সাধারণ মানুষেরই বুঝতে কষ্ট হবে না যে, আয়কর অফিসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কাজের চাপ কী প্রচণ্ড আর এই প্রচণ্ড চাপে প্রতিটি করের হিসাব কতখানি যথার্থ ভাবে সরকারের আয় বাড়াতে সমর্থ হবে তা বোঝাই যায়। সমস্যা প্রতিবছর বাড়লেও সরকারের নীতি এই দিকে নজর দেবে না, কেননা সুবিধাভোগী একাংশকে পোষণ না করলে, বর্ধিত কর থেকে রক্ষা না করলে নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধা দেখা দেবে। এই অনাদায়ী করের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। যেমন:

বছর	অনাদায়ী কর (কোটি টাকায়)
১৯৬৩—	২৭০·৭১
১৯৬৪—	২৭৭·৭৬
১৯৬৫—	৩৪১·৭০
১৯৬৬—	৩৯৮·৬১
১৯৬৭—	৫৪১·৭১
১৯৬৮—	৬২২·৬১
১৯৬৯—	৭৭৪·৪০
১৯৭০—	৮৪০·৭০

১৯৭৪ সালের অনাদায়ী করের পরিমাণ নিশ্চয়ই কমেনি। এই অনাদায়ী কেন আদায় হয়নি? সরকার কর আদায়ী ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলেননি কেন, কাদের স্বার্থে?

অথচ দেখা যাচ্ছে সরকার সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট তৈরি করে, পরোক্ষ কর বাড়িয়ে, ঘাটতি ব্যয় বাড়িয়ে, নোট ছাপিয়ে মানুষের দুর্দশা বাড়িয়ে চলেছে—কিন্তু প্রাপ্য কর আদায় না করে তাদেরই সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে, যারা…

১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি ব্যয় করেছে ১৯৪২ কোটি টাকা, অনাদায়ী আয় করের পরিমাণ ৮৪০ কোটি টাকা। ঘাটতি ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক টাকা অনাদায়ী কর থেকে আনতে পারতো। কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় সরকার তার নিজস্ব যে কারণে যথার্থ প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত থাকা সুবিধাজনক মনে করে, সে কারণটি কি খুবই অজ্ঞাত?

অনাদায়ী এই অর্থ সরকারের সম্পদ না বাড়িয়ে যাদের সম্পদ বাড়াবে, প্রতিদানে তারা যে উপকারের প্রত্যুপকার করবে না একথা অতি বড় বিশ্ব নিন্দুকও বলতে পারবে না।

সমগ্র ট্যাক্স আদায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে অধ্যাপক ক্যালডর যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সরকার যদি তা অনুসরণ করতো; এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয়ে যেত তাঁর উপদেশ কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় (করফাঁকি দাতাদের নিশ্চয়ই সুখের কারণ) সরকার তাঁর উপদেশ অনুসরণ করা প্রয়োজন বোধ করেনি।

প্রতিটি আয়করদাতার জন্যে যে ধরনের "রিটার্ন ফর্ম" অধ্যাপকের প্রস্তাবে ছিল, তা তখনকার অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী গ্রহণ করেননি। এমন কি নতুন কর প্রস্তাবের ব্যক্তিগত ব্যয়-কর (Expenditure Tax) পরে পরিত্যক্ত হয় এই কারণে যে, সরকার ব্যয়-কর আদায় করার যোগ্য প্রশাসন স্থাপন করতে সক্ষম নয় (এই হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে—অপদার্থতাও স্বীকার করে নেওয়া নিশ্চয়ই, অর্থমন্ত্রী টি, টি, কে কর ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন)। ফলে দেখা গেল ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে কর আদায় ও প্রাপ্য কর জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনায় অনেক নিচে নেমে গেছে। পরিণতি—ভয়াবহভাবে কালো টাকার বৃদ্ধি।

অবশ্য কিছুদিন আগে সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে আগেভাগে চোর জুয়াচোর ধর্মপুত্র তাবৎ মানুষকে জানিয়ে তদন্ত তল্লাস সুরু করে দিয়েছিল। যে সব

হাতের কাছেই ছিল এমনিভাবে টপাটপ ধরা পড়ল কিছু। তারপর যা হবার তাই হল। সেই চির পরিচিত অনিবার্য পরিণতি। একটু একটু করে মন্দার ভাব দেখা দিল। অথচ প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল এবার বুঝি আর রেহাই নেই কালো টাকার কারবারীদের। বাছাধনের দল এবার ধনেপুত্রে মরবে। কিন্তু...

অবশ্য ওয়াঞ্চু কমিশন, শুধু ওয়াঞ্চু কমিশন কেন, বিভিন্ন কমিশন, কমিটি বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছে। ওয়াঞ্চু কমিটি কালো টাকা, কর ফাঁকি, চোরাচালানী, কালোবাজারী দিন দিন যত বাড়ছে, ততোই সরকারী কর্মতৎপরতায় খানা-তল্লাসের সংখ্যা দিন দিন কেমন কমছে তা দেখিয়ে গেছেন। যেমন :

বছর	খানাতল্লাস ও বে-আইনী-সম্পত্তি আটকের সংখ্যা	সার্থক তল্লাসের সংখ্যা
১৯৬৪-৬৫	৩৯৭	৩৯৩
১৯৬৫-৬৬	৩০৬	২৯৩
১৯৬৬-৬৭	১৮৯	১৮৬
১৯৬৭-৬৮	১০৯	১০৬
১৯৬৮-৬৯	৮১	৭৯
১৯৬৯-৭০	১৭০	১৬৯
১৯৭০-৭১	১২৫	১২২

খানাতল্লাস কমেছে। নিশ্চয়ই তার অর্থ কর ফাঁকি দেওয়ার পরিমাণ কমেছে। কিন্তু সত্যই কি তাই ?

অথচ সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা নানাভাবে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া বা ক্রমবর্ধমান কালো টাকা সম্পর্কে অনবহিত থাকার চেষ্টা করে এসেছে। এদিক দিয়ে কালো টাকার খবর সাধারণর কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটি, কমিশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। অধ্যাপক ক্যালডরের অনুসন্ধানের আগে এস. বরদাচারীর নেতৃত্বে যে আয়কর তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, সেই কমিশন প্রতিবছর আয় কর, ফাঁকির ব্যাপারটাও তুলে ধরেছে। অধ্যাপক ক্যালডরের পর মহাবীর ত্যাগীর নেতৃত্বে (**Working Group on Central Direct Tax Administration**) 'প্রত্যক্ষ কর

প্রশাসনের ওপর কার্যকরী সমিতিও প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার ওপর অনুসন্ধান চালায়। পরিশেষে কৈলাসনাথ ওয়াঙ্কুর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটি (Direct Taxes Enquiry Committee) কাজ সুরু করে।

এইসব কমিটি, কমিশন সীমাবদ্ধভাবে আয়কর ফাঁকি দেওয়া ও কালো কালো টাকার বৃদ্ধির ব্যাপারে বার বার অবহিত করে এসেছে সরকারকে। কিন্তু সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে সেক্ষেত্রে? ব্যবস্থা হিসেবে এইটুকুই নিয়েছে বলা যায়—গাফিলতি আরো বেড়েছে বা জেগে ঘুমিয়ে পড়েছে আমাদের করিতকর্মা জাতীয় সরকার। অবশ্য মুখে দু'চারবার হুমকি নামক তুড়ি মেরেছেন সরকার পরিচালক গণ্যমান্যরা।

সরকারের এই আচরণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ওয়াঙ্কু কমিটির ইনটেরিম রিপোর্ট চেপে রাখার ব্যাপারে। বিস্তৃত সমীক্ষার পর ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে কমিটির ইনটেরিম রিপোর্ট সরকারের ঘরে জমা পড়ে। ফাইন্যাল রিপোর্ট তৈরির আগে জরুরীভাবে ইনটেরিম রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেওয়ার কারণ ওই রিপোর্টেই প্রকাশ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, যেভাবে কালো টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং জাতীয় অর্থনীতির প্রাণশক্তি এই ক্রমবর্ধিত কালো টাকার পরিমাণ যেভাবে বিধ্বস্ত করে চলেছে তার কারণে এখনই জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত দরকার। ইনটেরিম রিপোর্টের বক্তব্য ছিল :

We decided therefore to address ourselves to the task of making an interim report on matters which called for urgent remedial action and could not wait until our final report. One subject which we felt needed immediate action was that of black money as it has been eating into vitals of our economy.

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ওয়াঙ্কু কমিটির ফাইন্যাল রিপোর্ট বেরোয়—ইনটেরিম রিপোর্টের কোন মর্যাদা যেমন দেয়নি সরকার, ঠিক তেমনি কমিটির ফাইন্যাল রিপোর্ট ছাপার পর বাজে কাগজের ঝুড়ি ভর্তি করে। অবশ্যই কালোটাকার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে চলেছে এবং কালোবাজার ও চোরা চালানীর চাপে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতিও। অবশ্য অন্য কারণও আছে কিন্তু প্রধান ভূমিকায় কালোটাকা। ১৯৭২ সালে সাধারণ মূল্যান্তর বেড়েছে দশ

শতাংশ হারে, ১৯৭৩ সালে তেইশ এবং ১৯৭৪-এর প্রথম ছ মাসে মাত্র তিরিশ শতাংশ।

কালোটাকার বিস্তারমান সাম্রাজ্যের প্রসার যে ভাবে দেশের পণ্যের বাজার দখল করেছে, তাকে রোখা কি সম্ভব? রোখা যদি সম্ভব হ'ত তাহলে দেশের ধান, চাল, গম, চিনি, তেল, কয়লা, বেবিফুড—এককথায় মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসেরই আজ অবাধ কালোবাজারী কেন? দেশের শান্তি শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সবকিছু রোখার জন্যে সরকার পুলিশ, মিলিটারী সি. আর. পি. ইত্যাদির জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। অনেক সময় হুকুম দেওয়া হচ্ছে নির্বিচারে গুলি চালানোর। গুলি চলছে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় দুষ্কৃতিকারীকেই পুলিশ গুলি করে মারছে। শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের শাস্তি দিচ্ছে। কালোবাজারীরা কি দুষ্কৃতকারী নয়? হাতেনাতে ধরা পড়ে কজনকে মারা হয়েছে তাদের? নিশ্চয়ই তাদের গায়ে হাত তুলতে হলে দশবার ভাবতে হবে! নাহলে···

অধ্যাপক ক্যালডরের হিসাবপদ্ধতি অনুসরণ করেই ওয়াঞ্চু কমিটি রায় দিয়েছে যে, নির্দিষ্ট বেতনের বাইরে যে আয়ের ওপর ১৯৬১ সালে আয়কর ধার্য হয় তা হল ১৮৭৫ কোটি টাকা কিন্তু আসলে তা হওয়া উচিত ছিল ২৬২৮ কোটি টাকার ওপর। অর্থাৎ ১৯৬১ সালে ৮১১ কোটি টাকার ওপর আয়কর ধার্য করা যায়নি। ওই হিসাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে আয়কর এড়িয়ে গেছে ১২১৬ কোটি টাকা। এই হিসাব আরো কম করে ধরলে ১৯৬১-৬২ সালে ৭০০ কোটি টাকা, ১৯৬৫-৬৬ সালে ১০০০ কোটি টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৪০০ কোটি টাকার ওপর ফাঁকি পড়েছে।"

অধ্যাপক ক্যালডরের গণনা মেনে বলা চলে ওই সব টাকার ৩৩·৫ শতাংশ কর হিসাবে সরকারী ভাণ্ডারে জমা পড়ার কথা। শেষোক্ত বছরে অর্থাৎ ১৪০০ কোটি টাকার আয়কর ৪৭০ কোটি টাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ওই হিসাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে আয়কর ফাঁকি পড়েছে ৩৩৩ কোটি টাকা। ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই আয়কর ফাঁকির টাকার সঞ্চয় প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। কালো বাজারে ১৯৬৮ সালে ওই ৭০০ কোটি টাকার সম্পদই ছিল। বর্তমানে পরিমাণ নিশ্চয়ই বেড়েছে।

অবশ্য ওয়াঞ্চু কমিটির অন্যতম সদস্য Economic Times পত্রিকার সম্পাদক মিঃ রঙ্গনেকার কালোটার পরিমাণ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

মিঃ রঙ্গনেকারের মতে ১৯৬৮-৬৯ সালে অন্ধকার জগতের আয় যা ট্যাক্সের হাত এড়িয়ে গেছে, তা হলো ২৮৩৩ কোটি টাকা—১৯৬৯-৭০ সালে ৩০৮০ কোটি টাকা। রঙ্গনেকারের হিসাবে বছরে মাত্র ১৩ শতাংশ হারে কালোটাকার সম্পদ বাড়ছে। ওই হিসাব ধরলে ১৯৬৯-৭০ সালে কালোটাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭১০ কোটি টাকা। শতকরা ১৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধির অনুপাত না ধরলেও বর্তমানে বছরে গড়ে ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধির হার ধরা হলে বিগত পাঁচ বছরে, কালোটাকার পরিমাণ বাড়বে ২৫০০ কোটি টাকা মাত্র। অর্থাৎ বর্তমানে কম করেও ১০,০০০ টাকার সম্পদ সমান্তরাল ভাবে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। অতএব···

গত ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে (প্রশ্নটি করেছিলেন একজন বিরোধী পক্ষের সদস্য। লিখিত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন নং ৩৮৩) কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী জানান যে, বর্তমানে মারুতি কোম্পানীতে (মারুতী মোটরগাড়ি শিগ্রই বাজারে আসছে) দশ হাজারের বেশি শেয়ার আছে এমন ব্যক্তি অথবা কোম্পানীর সংখ্যা হচ্ছে একচল্লিশ।

জিওল গোষ্ঠীর বি. সি. জিওল অন্যতম একজন অংশীদার এবং ইনি বারো হাজার শেয়ারের মালিক। লোকসভায় ১৯৭৪ সালের বর্ষাকালীন অধিবেশনে একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা যায় যে, আয়কর বিভাগ কালোটাকার সন্ধানে জিওল গোষ্ঠীর বিভিন্ন বাসগৃহ এবং কোম্পানীর অফিসগুলোতে তল্লাসী চালিয়ে বহু সন্দেহজনক দলিল, হিসাব বহির্ভূত টাকা উদ্ধার এবং আটক করেন।

এবং আর একটি প্রশ্নের উত্তরে কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী জানান যে, মারুতি কোম্পানীর আটজন অংশীদারের বিরুদ্ধে সি. বি. আই তদন্ত চলছে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে আছে—কোম্পানীর তহবিল তছরুপ, রপ্তানীর জন্যে নির্দিষ্ট মাল অন্যত্র পাচার, বৈদেশিক বিনিময়ের নিয়মবিধি লঙ্ঘন, কর ফাঁকি ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি। এই সমস্ত অংশীদারের মধ্যে আছে—অরবিন্দ কুমার, নন্দলাল কিলাচাঁদ, রামনিবাস রুই, মহম্মদ সৌকত, সন্তোষকুমার তুলমান, নরেশকুমার তুলমান এবং নরেশকুমার শর্মা।

কালোটাকার খোঁজে আয়কর দপ্তর ৪১টি ইস্পাত কোম্পানীর দপ্তরে তল্লাসী চালিয়েছে (ডিসেম্বর '৭৪) এবং চারটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমন:

কোম্পানীর নাম	হিসাব বহির্ভূত আয়ের পরিমাণ (টাকার হিসাবে)	আয়কর ফাঁকির পরিমাণ (টাকার হিসাবে)
১। সুরেখা গোষ্ঠী	৬২,৫৬,৮৫০	২৮,৬৭,৪০৩
২। জিগুল গোষ্ঠী	২,৫৫,৯০,৬৬২	১,৯১,৯১,৬০৫
৩। বিশ্বম্বর দয়াল বদ্রীপ্রসাদ গোষ্ঠী	৩,৬০,৫২৩	৩,০৪,৩২৬
৪। শেঠ গোষ্ঠী	৩১,৪৯,৬০৫	১৯,৫৩,২০৪

অবশ্য কঠোর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এদের বিরুদ্ধে।

পাবলিক একাউন্টস কমিটি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি আয় গোপন করেছে এমন পঁচাত্তরটি নামের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। অবশ্য ওই পঁচাত্তরের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে মাত্র আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে এবং 'দু' চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা বিবেচনা হচ্ছে। এদের মধ্যে মনোনীত কয়েকটি নাম:

আয়করদাতার নাম	লুকায়িত আয় (হাজার টাঃ হিঃ)	কতটাকার ফাঁকি (হাজার টাঃ হিঃ)	কোন বছরে
১। মেসার্স মোদী প্রাঃ লিঃ	১১৩২	৬১৮	১৯৬৪-৬৫
২। মেসার্স বস্তীরাম নারায়ণ দাস	১৩২৯	১১১৮	"
৩। শ্রীচিরঞ্জীলাল গোয়েঙ্কা	১৫৫৫	১৩৭৯	"
৪। বেনেট কোলম্যান (সাহু জৈন)	৬২৪	১১১৮	"
৫। মেসার্স ফিলমস্থান (প্রাঃ) লিঃ	৯০৩	১৭৫৭	১৯৫৬-৫৭
৬। মেসার্স মধুসূদন গোবর্দ্ধন দাস	৪২৪০	৩৪৬৯	১৯৬৪-৬৫
৭। ঐ	৬০১	৪৬২	১৯৫৭-৫৮
৮। মেসার্স আর বি শ্রীরাম দুর্গাপ্রসাদ	৩৪২৯	২১১৪	"
৯। ঐ	৩৪৪৬	১৯১০	২৯৫৮-৫৯
১০। ঐ	৫০০	২৯২	১৯৬৪-৬৫
১১। শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমীয়া	৪৯১১	৩৬৫৯	১৯৬৫-৬৬
১২। ঐ	৮৯৮	৭১২	১৯৬৪-৬৫
১৩। মেসার্স অকল্যাণ্ড জুট কোঃ লিঃ	৯৪২	৪৭১	"
১৪। " নর্থব্রুক জুট কোঃ লিঃ	১৪০৩	৮৪১	"
১৫। জে-এস-পার্কার	৪১১৯	৪০৯৮	১৯৬২-৬৩

এদের অনেকেই মারুতি কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার।

চোরাচালান বিরোধী যে বিশেষ আইনে এতদিন (১৪ এপ্রিল '৭৫) বিদেশী মুদ্রাবিধি লঙ্ঘনকারীদের ধরা হয়েছিল, বহু ক্ষেত্রেই এখন আর তা হবে না। আইন রইল। কিন্তু বিদেশী মুদ্রা পাচারের সব থেকে বড় অংশই এই আইনের আওতার বাইরে পড়ল।

শুধু তাই নয়, কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছে বিদেশী মুদ্রাবিধি লঙ্ঘনের কোনক্ষেত্রেই রাজ্য স্বরাষ্ট্রসচিব তার ওই বিশেষ আইন 'কফে পোসা'য় গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় সই করতে পারবেন না। যা করবার দিল্লীই করবে। সই করবে কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কোন অফিসার (সুন্দর)।

সেই পরোয়ানাও হবে টাউট বা ওই শ্রেণীর কিছু লোকের বিরুদ্ধে কিংবা কমপেনসেটরি পেমেন্টের জন্যে। অর্থাৎ বিদেশে কেউ টাকা রোজগার করছে, সরকারী খাতে তা এদেশে পাঠালে না। এখানে তার প্রতিনিধিকে কেউ ভারতীয় টাকা দিলে। বিনিময়ে সে বিদেশে তার আত্মীয়কে পাউণ্ড বা ডলার দিলে। এরকম অভিযোগে এই পরোয়াণা খাটবে।

কিন্তু আমদানী রপ্তানীর রন্ধ্রপথে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে, তা এর থেকে বাদ পড়ে গেল। কারণ কেন্দ্র স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, বে-আইনী-ভাবে বিদেশে টাকা জমালেই কফে পোসায় ধরা চলবে না। যতক্ষণ না প্রমাণ করা যাচ্ছে এই টাকা চোরাচালানের কাজে লাগছে (অতি ন্যায্য কথা !)।

অবশ্য চোরা চালান বিরোধী অভিযানের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই জানেন, এরকম প্রমাণ দাখিল করা দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং বিদেশে ভারতবর্ষের সে রকম ব্যবস্থাও নেই (সেই জন্যেই তো এই নতুন আইন !)। প্রচলিত আইনে চোরাচালান দমন করা যাচ্ছিল না বলেই ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে মিসা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বোম্বাই কলকাতা ও অন্যত্র বহুলোককে মিসায় আটক করা হয়েছিল। তারপর? তারপর যা হবার তাই হল। আস্তে আস্তে ধর পাকড়ে ভাটা পড়ল। অনেক ব্যাপারে দিল্লী বাদ সাধল। কারণ শুধু ধরলেই তো হল না—দেখেশুনে ধরতে হবে ! আর এমনই মজার ব্যাপার, সাধারণ লোক পাওয়া গেল না এসবের মধ্যে। ওপর মহলে, বিশেষ করে ব্যাবসাদারদের ধরলে চলে না। কারণ ইলেকসনের চাঁদা, আরো অনেক উপকার। অতএব…

একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির বক্তব্য (৪.৪.৭৫)—সরকারই কালোটাকা ও কর ফাঁকির জন্য দায়ী।

তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলই কি তাদের নির্বাচনী তহবিলের জন্য অধিকাংশই কালোটাকায় এবং বেআইনী ভাবে দান গ্রহণ করে অর্থনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি ?

তিনি বলেন, সম্প্রতি কালোবাজারী, চোরাই চালান ও ওই ধরনের অপরাধ দমনের জন্য সরকার দেরি করে এবং দ্বিধা নিয়ে ব্যবস্থা নিলেও কর ফাঁকি ও দুর্নীতির জন্য কোন শাস্তি অজ্ঞাত কারণেই হচ্ছে না। যদিও ওই ঘটনাগুলি খুব জানা এবং সহজেই নজরে পড়ে।

তিনি বলেন, এইভাবেই অর্থনৈতিক ভ্রষ্টাচারের পথে কোন বাধা নেই। এতে সম্মানহানিও হয় না। সরকার নিজেরাও তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতির জন্যই কালোটাকা, কর ফাঁকিও ও দুর্নীতির অস্তিত্ব ও তার লাগামহীন বৃদ্ধির জন্য অনেকটা দায়ী।

বিদেশী মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রবীণ মন্ত্রীর (নামটা উহ্যই থাক) বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। মন্ত্রী মহাশয় কয়েকমাস আগে ইউরোপ গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য স্ত্রীর চিকিৎসা। যাবেন লণ্ডন এবং প্যারিস। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৫০০ টাকার বিদেশী মুদ্রা দেয়। শুধু চিকিৎসার জন্য লেবেল দিয়ে।

কিন্তু মন্ত্রীবর লণ্ডন এবং প্যারিসে যে হোটেলে ছিলেন (ড্রাইভার সহ ভাড়া গাড়ি সহ) এবং যেভাবে খরচ খরচা করেছেন তাতে ওই টাকায় একটি সপ্তাহ চলে কিনা সন্দেহ। অতএব···

ললনার ডাকে ঘুম ভাঙল। বাইরে তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে।

বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার রে এত ভোরে ?'

ও বলল, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও—আমি আসছি।'

কথাগুলো বলেই চকিতে অদৃশ্য হল ও। বাধ্য ছেলের মত তৈরি হয়ে নিলাম। একটু পরে ফিরে এসে বলল, 'হয়েছে, চল।'

বললাম, 'কোথায় ?'

আমার কথার উত্তর দিলে না ও। হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেল। গলি পার হয়ে খানিক যাবার পর জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবে বল ?'

বিস্মিত হলাম। বললাম, 'কোথায় যাব মানে ?'

—'আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি।' হাসল ও।

—'তা সেকথাটা বললেই তো পারতিস।' রাগ করলাম আমি।

ও তেমনি মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাকে একটু চমকে দিতে চেয়েছিলাম।'

—'তাই বল।' নিশ্চিন্ত হলাম আমি। রাগ পড়ে গেল।

ও বলল, 'এবার বল কোথায় যাবে ?'

বললাম, 'দূরে না কাছে ?'

—'যেখানে তোমার ইচ্ছা।'

—'যদি অনেকটা দূরে যাই ?'

—'চল।'

—'বাড়িতে যদি তোর জন্যে ভাবে ?'

—'তোমার জন্যেও।'

—'ধর আমার জন্যেও।'

—'ভাবুক।'

—'তাহলে…।'

—'চল যেখানে খুশি তোমার।'

পকেটের অবস্থাটা হিসাব করলাম। মন্দ নেই। আমরা দুজনে—লনা আর আমি, সহর থেকে দূরে কিছুটা ঘুরে আসতে পারি।

বললাম, 'দেখ অনেকদিন ট্রেনে চড়িনি।'

লনা বলল, 'আমিও।'

—'যাবি।'

—'চল।' উৎসাহিত হল ও। খুব খুশি। আবার বলল, 'কিন্তু পয়সা ?'

—'তোর কাছে নেই ?'

—'খুব কম। দু তিন টাকা।'

বললাম, 'একটা হাফ একটা ফুল টিকিট কাটলে ওতেই হয়ে যাবে। খাবার পয়সা আমার কাছে আছে।'

—'কিন্তু আমার হাফ টিকিট চলবে না।'

বললাম, 'চালিয়ে নিলেই চলবে।'

'না গো ছোটকা। এখন খুব কড়াকড়ি।'

—'কে বললে ?'

—'আমি জানি।' ও বলল, 'গত বছর রেল ধর্মঘট হয়েছিল না। ওহো, তুমি তো তখন জেলে। জান, সে কি কাণ্ড। সেজকার একবন্ধু এসে আমাদের বাড়ি লুকিয়ে ছিল। তার পর ধর্মঘট মিটে যেতে চাকরী চলে গেছে সেজকার বন্ধুর।'

—'কেন ?'

—'তা কি করে বলবো বল—নিশ্চয়ই কিছু করেছিল। কাগজে তো কত কিছুই বেরিয়েছিল। কত ভাল-ভাল কথা, কত খারাপ কথা। রেল কর্মচারীরা কি ভীষণ অন্যায় করেছে ধর্মঘট করে। আরো কত কথা। রেল-মন্ত্রী কখনো ভয় দেখিয়েছিল—কখনো আদর করেছিল। যেমন ধর বাপ মা ছেলে মেয়েদের শাসন-আদর করে। তারপর ধর ওই রেল কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া মেটালে দেশের কি ভীষণ ক্ষতি হবে। ওই ক'লাখ কর্মচারীর জন্যে কোটি কোটি মানুষ ভুগবে। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। দেশের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। আরো সব কথা।'

লনা সমানে বক-বক করে চলেছে। শুনতে খারাপ লাগছে না। সকাল হচ্ছে। আমরা শেয়ালদার দিকে চলেছি। একটা ট্রাম আসছে দেখতে পেলাম। শেয়ালদা ষ্টেশন আর বেশি দূর নয়। লনা চুপ করতে বললাম, 'তারপর ?'

ও বলল, 'তারপর কি ?'

—'তুই থামলি কেন ?' বললাম আমি।

ও বলল, 'ঠাট্টা করছো ?'

বললাম, 'নারে। আমি জানতুম না—তোর কাছে শুনছি।'

লনা বলল, 'জান ছোটকা রেল ধর্মঘটের জন্যে আমরা আম খেতে পাইনি বললেই চলে।'

—'কেন ?'

—'বারে গাড়ি বন্ধ—আম আসবে কি করে। অবশ্য রেডিওতে রোজ হাজার বার বলতো সব ঠিক আছে—সব স্বাভাবিক। কিন্তু জান বাজার শুধু আগুন নয়—পাওয়া যায়নি অনেক কিছুই। আর জান রেল ধর্মঘট মেটাবার পরই বাজারের সব কিছুই লাফিয়ে লাফিয়ে চড়তে সুরু করেছিল। সবাই বলাবলি করতো ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্যে ব্যবসাদাররা যে টাকা দিয়েছে—সেটা তুলবে না!'

বললাম, 'ব্যবসাদাররা টাকা দেবে কেন ?'

লনা এমনভাবে আমার দিকে চাইল, লজ্জা করল আমার। অবশ্য ওর চোখে ক্ষমার দৃষ্টি। আমি চুপ করে রইলাম। ও একটু চুপ করে থেকে আবার কথা বলতে সুরু করল। লনারা কথা বলতে ভালবাসে এবং অল্প বয়েস হলেও অনেক কিছু জানে, খবর রাখে।

কিছুদিন আগে পাটকল ধর্মঘট হয়ে গেল। লনা বলেছিল, 'এ হচ্ছে বছর-কাবারী ব্যাপার।'

বলেছিলাম, 'বলিস কি ?'

ও বলেছিল, দু'বছর দেখলাম। আর জান 'দু' দলই এর কারবারী। পাট-কলে যারা কাজ করে তারা হচ্ছে লুডোর ঘুঁটি। শুধু পড়েই চলেছে। অবশ্য ধর্মঘট না করতে চাইলেও করতে হবে। জান ছোটকা এখন ধর্মঘট করতে শ্রমিকদের সম্মতি-অসম্মতির দরকার হয় না। নেতারা ধর্মঘট ডাকে—ধর্মঘট ভাঙে, নেতাদের ইচ্ছে অনিচ্ছেটাই আসল ব্যাপার। আর পাটকলে তৈরি মাল জমে গেলেই ধর্মঘট হয়। ডাকে দু'তরফেই। কি চমৎকার ব্যবস্থা বলতো ?'

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত প্রায় ছয় লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ১৯৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে আরো বেশি। আর পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে যেমন পাটকল—তেমনি পাটের ফলনের ক্ষেত্র। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের চাষী পাটের দাম পায় না। কর্মীরা বছরে একবার করে মালিকের সুবিধা করে দিতে ধর্মঘটে নামে।

পাটকলওয়ালারাও পাটের মরসুমে পাট কেনার বাবদে পাটকলের টাকায় দালাল মারফত গ্রাম থেকে পাট কিনে কয়েক শো কোটি সাদা টাকা কালো করে নিজেদের ঘরে ঢোকায়। অবশ্যই পাটকলের টাকা মালিকদের নয়—শেয়ারহোল্ডারদের। বৃদ্ধির বলে নামে মালিকের দল বছরের পর বছর ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠছে। তার ওপর আছে আণ্ডার ইনভয়েসিং—ওভার ইনভয়েসিং।

সরকার সব জানে। মাঝে মধ্যে সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু কাজ হয় না। শুধু মাত্র একটু আধটু ফোঁস—যার নাম কালো টাকা হটাও। কিন্তু হটাবার ইচ্ছা কি আছে ? সাধারণ মানুষের উপকারে লাভ কি ?

ট্রেন চলছে। বাইরে সকালের রোদ। লনা জানলার ধারে বসেছে। ওর কচি মুখে রোদের ঝলক। কটা ষ্টেশন পার হয়ে এসেছি আমরা। ফুটন্ত চা প্রায় হাত পুড়িয়ে কিনে খেয়েছি। কথা বলছিলাম। এখন দুজনেই চুপচাপ। লনা বাইরে চেয়ে আছে। সহরের সীমানা পার হয়েছি। চলেছি দক্ষিণে। ষ্টেশনের কাছে কাছে একটু সহর। ফাঁকা মাঠ। এ গ্রীষ্মে কাজ নেই। কালো কালো মানুষ। চালা বাড়ি। আধঘোমটাটানা কলসী কাঁখে বউ। ছুটোছুটি করা ছেলেমেয়ে। গরুর গাড়ি। পুকুর। অসংখ্য ছবি। সেই চির পরিচিত গ্রামের ছবি। সহরের চোখে স্বপ্ন আঁকে। বাস্তব কি খুব সুখের? ট্রেনের মধ্যে চিৎকার করছে একটা বুড়ি। ঝগড়া করছে। সঙ্গের ঝাঁকাটা ঝুলে।

লনাকে ডাকলাম না। ও ঝগড়া শুনে একবার মাত্র ঘুরে তাকিয়েছিল। আবার বিভোর হয়েছে গ্রাম দেখতে। আমার মাথার মধ্যে আবার সেই চিড়-চিড়ে ভাবটা জাগছে। একটু-আধটু জ্বালা করছে। সব কিছু ভুলে থাকলে এমন হয় না। আগে বেশ ছিলাম, এখনকার এই আমি কেমন যেন পাল্টে গেছি। যত দিন যাচ্ছে আরো পাল্টাচ্ছি। আমার মধ্যে পরিবর্তন আসছে। আমি যেন আত্মসচেতন হয়ে উঠছি ক্রমশঃ। এত দুঃখ, বেদনা, জ্বালা আর হতাশা আমার মধ্যেই ছিল, আমি জানতাম না। হয়তো এগুলো জন্মেছে। কাকে জিজ্ঞাসা করি ভাবি—লোক খুঁজে পাই না। সকলের মধ্যেই দেখি আমার সব কিছুর প্রকাশ।

গায়ত্রী-প্রসন্নের কথা তাই বার বার মনে পড়ে। যদিও তার অনেক কথা বুঝতে পারতাম না। অনেক যুক্তি মানতে পারতাম না। তর্কও করেছি তা নিয়ে বড় কম নয়। তবু বুঝতাম তিনি কি যেন খুঁজছেন। কিছু বলতে চান। বলতেন, 'পৃথিবী এবং মানুষ একই সঙ্গে এগুচ্ছে। অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। বর্তমান বলে কিছু নেই। আমাদের কোন কিছুতেই স্থায়িত্ব নেই। চলমান জীবন। মানুষ চলছে। খুঁজছে। সেই পথ—যে পথে আছে সেই সত্য শিব এবং সুন্দর। কোন পথে? সেটাই খুঁজতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে। সন্ধান দিতে হবে মানুষকে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষই আজ পথহারা। সম্পদ প্রাচুর্য সব আছে, শান্তি কোথায়? মনে? মনটাকেই তো সন্ধান দিতে হবে। মন শান্ত হলে শান্তির স্বাদ দুর্লভ নয়। সব সমস্যাই তখন মিটে যাবে।

বলতেন, 'কংগ্রেসের বড় দুর্দিন যাচ্ছে। দেশসুদ্ধ মানুষ মারমুখো হয়ে উঠছে। সভা সমাবেশ থেকে সর্বত্র সমস্ত দেশ কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর। আর অবস্থার সৃষ্টি নিশ্চয়ই বিনা কারণে হয়নি। দেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে। যার হাতে ক্ষমতা সে যদি পদে পদে অক্ষমতা দেখায় তাহলে কেউ তাকে ক্ষমা করে না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই কম বেশি অসন্তোষ লেগে আছে।

'গণতন্ত্রের দেশে জনগণ ভোট দিয়ে কোন একটা দলকে রাজতক্তে বসায়। কিন্তু ক্ষমতায় একবার অধিষ্ঠিত হলে শাসকগোষ্ঠী ভোটদাতাগণকে সমীহ করে চলবার প্রয়োজন মনে করে না।

'কংগ্রেস যখন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তখন আশ্চর্য মনোবলের এবং চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে। দেশবাসী মুগ্ধ হয়ে দেখেছে কংগ্রেস-রথীদের শৌর্যবীর্য, তাঁদের চরিত্রমহিমা—স্বার্থত্যাগে অকৃপণ, দুঃখ বরণে অকুণ্ঠিত। দেশসুদ্ধ মানুষ তাদের কথায় উঠেছে বসেছে—দুঃখ বরণ করেছে। সেই কংগ্রেস একদিন ক্ষমতায় এল। ক্ষমতা গ্রহণের সুরুতেই পরিকল্পনায় ভুল হয়েছে। ক্ষুৎপীড়িত দেশে ক্ষুধার অন্ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কাজেই পরিকল্পনার সর্ব প্রথম উদ্যোগ হওয়া উচিত ছিল কৃষির উন্নতি। নিরন্নের ঘরে নবান্ন দিয়ে স্বাধীনতার উৎসব করা উচিত ছিল। শিল্পেরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু খাদ্য আগে যন্ত্র পরে। পেটে খেলে পিঠে মোট বওয়া যায়, কলে কারখানায় খাটা যায়। সব চেয়ে বড় কথা, পেটের ভাত যোগাতে পারলে তবেই মনের নাগাল পাওয়া যায়।

'ক্ষমতায় আসবার পর দীর্ঘদিন পার হয়েছে। গোড়ায় দেশবাসীর যতখানি শুভেচ্ছা নিয়ে কংগ্রেস তার যাত্রা সুরু করেছিল আজ তার পুঁজি অনেকখানিই উবে গেছে। সব কিছু একসঙ্গে সামলাবার মত অর্থ-সামর্থ্য আমাদের নেই। প্রায়রিটির প্রশ্ন পুরোভাগে রাখা উচিত ছিল। সেখানেই প্রচণ্ড ভুল হয়েছে। বিরাট বিরাট প্রজেক্ট-এর চাপে অব্যবহিত প্রয়োজনগুলো অবান্তর বিবেচিত হয়েছে। এসব ভুল মারাত্মক। পরিকল্পনাকালে মনে রাখা উচিত ছিল যে দেশের অক্ষম মানুষকে সক্ষম করে তুলতে পারলেই দেশের ক্ষমতা বাড়ে, ক্ষমতাসীনেরও ক্ষমতা বজায় থাকে।

'কংগ্রেস দীর্ঘদিনে কিছু করেনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। সাধারণ মানুষ তার কতটুকু ফলভোগী হয়েছে সেটাই দেখতে হবে। কারণ এদেশটাতে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। দেশ জুড়ে আজ চোরাবাজার।

জোচ্চুরি আজ পদে পদে। বর্বর যুগে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হত, সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ডের রেওয়াজ ছিল। আজ হীন অপরাধেও দণ্ড মুকুব হয়ে যায়। ফলে দেশ থেকে অপরাধবোধ লোপ পেতে বসেছে। আজ দরকার অপরাধের কঠিন শাস্তি।

'আর বিরোধীদলগুলো শুধু মাত্র বিরোধিতা করার জন্তেই জন্মেছে। অন্যান্য দেশে ষ্ট্রাইক জিনিসটা last resort বা চরম পন্থা। আমাদের দেশে ষ্ট্রাইকই প্রথম পন্থা। কোন বিষয়ে মতান্তর হলেই ষ্ট্রাইক। আগে শুধু বিরোধী পক্ষ ডাকতো—এখন ডাকে সরকার পক্ষও। এ যেন হট্টমালার দেশ। ক্ষমতাসীনের ক্ষমতা বজায় রাখা—বিরোধিদের বিরোধিতা করা। মরছে মানুষ। সাধারণ মানুষ। লুডোর ঘুঁটি হয়ে এঘর-ওঘর করছে শুধু। এভাবে চলবে না, চলতে পারে না।'

গায়ত্রী-প্রসন্ন আরো অনেক কথাই বলতেন। সব মনে নেই। শুধু মনে পড়ে তাঁকে। তাঁর উজ্জল চোখ দুটি। আমার জীবনের অনেক উজ্জল স্মৃতি। বুকে বল আসে। মনে সাহস পাই। বাঁচার আকাঙ্ক্ষাটা দানা বাঁধে।

আবার মাঝে মাঝে বড় হতাশ হয়ে পড়ি। ভয়-ভয় করে। কেন এই ভয় বুঝতে পারি না। অবশ্য ভয়টা কেন বুঝতে পারলেই তো মিটে গেল। ভয় থাকে না আর।

এখন দিন কাটে আমার অলস চিন্তায়। কিছু বইপত্র পড়ি। হাতের কাছে কাগজ থাকলে টেনে নিই। গল্প উপন্যাসে মন টানে না। বড়দার ছেলেটা অনেক ছোট ছোট কাগজ কেনে। সেগুলোতে শুধু সরকারী কেচ্ছা। ভাল লাগে না। ভাবায় না। ক্ষণিকের উত্তেজনা তৃপ্তি দেয় না। ওগুলো যেন এখনকার রুক্ষ-মাথা বড় বড় চুলের ছেলের মত। চট করে মাথা গরম। অবশ্য অনেক কিছু জানা যায়। ভাবি কি হবে এসব জেনে। আবার মনে হয় জেনে রাখা ভাল। কদিন আগে একটা লেখা পড়েছিলাম। বাজেট আলোচনা। ভাল লেগেছিল। লেখকের বক্তব্য :

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে অভিনবত্ব কিছুই নেই। উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রধান প্রয়োজন হল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উন্নয়নহার ত্বরান্বিত করা; ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ জিনিসটি এখন খুবই জরুরী। দেশে মুদ্রাস্ফীতির চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি—মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করার জরুরী প্রয়োজন সামনে রেখেই এই বাজেট তৈরি হয়েছে বলে কেন্দ্রীয়

অর্থমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনীয়ম দাবি করেছেন। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ যে মুদ্রা পরিমাপের অসম্ভব বৃদ্ধি তা-ই প্রমাণিত হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেটের ঘাটতির মধ্যে।

১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১২৬ কোটি টাকা। চারমাস না যেতেই ১৯৭৪ সালের ৩১শে জুলাই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লোকভায় একটি পরিপূরক বাজেট পেশ করেছিলেন এবং তাতে ২৩১ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশ্য তখন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, যে-ভাবেই হোক বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ১২৬ কোটি টাকায় সীমায়িত রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬২৫ কোটি টাকা; এই টাকার মধ্যে ৩৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্যসামগ্রী ও সার আমদানী করার দরুন। হয়তো এই ৩৩০ কোটি টাকা দেশের মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বাড়ায়নি, কিন্তু ঘাটতির অবশিষ্ট ২৯৫ কোটি টাকা মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বাড়াবার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে রাজস্বের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১০৩০৪ কোটি টাকা। ভারতবর্ষে এই প্রথম রাজস্বের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১০৭৬৮ কোটি টাকা। রাজস্বের এই ব্যয় নির্বাহের জন্যে ২৮৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্যের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ থাকবে ২৩৯ কোটি টাকা। তা করার পরেও বাজেটে ২২৫ কোটি টাকার ঘাটতি থেকে যাবে।

যেসব জিনিসের ওপর করের হার বাড়ানো হয়েছে তার মধ্যে আছে খোলা-বাজারে বিক্রয়যোগ্য চিনি, চা, মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ, সিগারেট, নস্য, জর্দা, বিড়ি, শ্যাম্পু, এয়ার কণ্ডিশনার, অ্যালুমিনিয়াম, রেফ্রিজারেটর, পাখা, টায়ার, সিমেন্ট, মিহি ও অতি মিহি কাপড়, পেট্রোল ও পেট্রোলজাত জিনিস, টেপরেকর্ডার, গ্রামোফোন, রেকর্ড প্লেয়ার, কাঁচ ও চিনেমাটির বাসন প্রভৃতি।

খোলা বাজারে চিনি বিক্রির ওপর উৎপাদন শুল্ক মূল্যানুপাতিক ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৭.৫ শতাংশ করা হচ্ছে; খান্দেসরি চিনির ওপর মূল্যানুপাতে ১৭.৫ শতাংশ শুল্ক বসবে। এর ফলে মোট আয় হবে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। রপ্তানীর জন্যে নির্দিষ্ট চা ছাড়া সব রকম খোলা চায়ের ওপর কিলো পিছু দশ থেকে পনেরো পয়সা পর্যন্ত শুল্ক বৃদ্ধি হবে। এর ফলে অতিরিক্ত আয় হবে

৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। সিমেন্টের ওপর মূল্যানুপাতে ৩০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি করে পাওয়া যাবে ১৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। পেট্রোলের ওপর শুল্ক লিটার পিছু দশ পয়সা হারে এবং ফারনেস অয়েল বাবদ শুল্ক লিটার পিছু তিন পয়সা হারে বাড়ানো হবে। পেট্রোলজাত জিনিস থেকে পাওয়া যাবে ২৫ কোটি টাকা। তামাক ও তামাকজাত জিনিস থেকে ২৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। প্রসাধন দ্রব্যের ওপর ৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ শুল্ক বাড়বে। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ওপর শুল্ক বাড়ানো হয়েছে ৭৫ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত। কাপড়ের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের ফলে আয় হবে ৪৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা (সেই সঙ্গে মোটা কাপড়ের দামও নিশ্চয়ই বাড়বে)।

চা, চিনি, কাপড়ের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি এবং বিড়ি, সিগারেট, জর্দা প্রভৃতি তামাকজাত জিনিসের ওপর শুল্ক-বৃদ্ধি সব চেয়ে বেশি আঘাত করবে সাধারণ মানুষকে। এ জিনিসগুলোর ওপর কর বাড়িয়ে এগুলোর ক্রয়ের পরিমাণ অথবা ভোগের পরিমাণ খুব বেশি কমানো যাবে না—অথচ বাজারে এ জিনিসগুলোর দাম বেড়ে যাবে। ঘাটতি পুরনের জন্যে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের চেষ্টায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা বাড়িয়েছেন; এটাকে মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী বাজেট বলা যায় কি?

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটের একটা ভাল দিক হল ব্যক্তিগত আয়করের হার না বাড়ানো। শুধু তাই নয়, সঞ্চয় বাড়াবার ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। আয়কর ধার্য করার ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও জীবন বীমার প্রিমিয়ামের প্রথম চার হাজার টাকা সম্পূর্ণ ছাড় এবং পরবর্তী ছ'হাজার টাকার পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থাকে সকলেই স্বাগত জানাবেন। যারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা ধার করেননি তাঁদের বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থাও সমর্থনযোগ্য। যাঁদের বাৎসরিক আয় ১২০০ টাকা, তাঁদের ছেলেমেয়েরা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডাক্তারী, ইনজিনীয়ারিং ও কারিগরী বিষয়ে শিক্ষার্থী হলে আয়কর ধার্যের ক্ষেত্রে তাঁদের মোট আয় থেকে সন্তান প্রতি এক হাজার টাকা রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সকলের সাধুবাদ পাবেন। তবে মাত্র দুজন সন্তানের ক্ষেত্রেই এই ছাড় দেওয়া হবে। যেসব ক্ষেত্রে সন্তান এইসব বিভাগে ডিপ্লোমার জন্যে পড়াশোনা করছে সেসব ক্ষেত্রে সন্তান প্রতি ৫০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে।

সঞ্চয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অর্থমন্ত্রী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, জীবন বীমা প্রভৃতির ব্যাপারে যে সুযোগ সুবিধে দিয়েছেন সেগুলো উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপকারে আসবে।

কোম্পানী লভ্যাংশ বাবদ বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছে। অর্থাৎ বাড়তি লভ্যাংশ দেওয়া না হলেও বাড়তি লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাবে এবং বিলম্বে যে লভ্যাংশ দেওয়া হবে তা বার্ষিক দুটি কিস্তিতে দিতে হবে এবং এজন্য সুদের কোন ব্যবস্থা থাকবে না।

শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ দু লক্ষ টাকার বেশি হলে আয়করের হার হবে ৬০ শতাংশ, বর্তমানে এই হার ৫৫ শতাংশ। এর ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালে বাড়তি আয় হবে প্রায় ৩ কোটি টাকা।

ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী সংস্থা ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহে নিরুৎসাহিত করার জন্যে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানত বাবদ দেয় সুদের ৮৫ শতাংশ মাত্র কর ধার্যের উদ্দেশ্যে ব্যয় দেখানোর অনুমতি দেওয়া হবে। এর ফলে অতিরিক্ত আয় হবে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পে ইকুইটি শেয়ারে লগ্নী বাবদ আয়ের ক্ষেত্রে সম্পদকর রেহাই দেওয়া হবে।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি মোটামুটি খারাপ হয়নি। আশা করা যায় বিনিয়োগ ধারা আংশিক পুনরুজ্জীবিত হবে। কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ওপর আরও বেশি বোঝা চাপানো সমর্থন করা যায় না। অতি সম্প্রতি কাপড়ের দাম কিছুটা কমের দিকে যাচ্ছিল, এখন কাপড়ের দাম আবার বাড়বে। খোলা বাজারে চিনি নিয়ে সুরু হবে ফাটকা। সর্বসাধারণের সর্বাধিক প্রিয় পানীয় চা-এর কি হাল হবে সেটাও না দেখলে বোঝা যাবে না।

১৯৭৫-৭৬ সালে খাদ্য সামগ্রী বাবদ ভরতুকির পরিমাণ দেওয়া হবে ২৯৫ কোটি টাকা। ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক যোজনা ব্যয় হবে ৫৯৬০ কোটি টাকা; ১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল, ৪৮৪৪ কোটি টাকা। এই বাজেট থেকে কেন্দ্রীয় যোজনায় ২৫৫৮ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

অর্থমন্ত্রীর মতে সরকার উন্নয়নমূলক ব্যয় বরাদ্দের কোন কাটছাঁট করতে চান না।

কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৩ কোটি টাকা থেকে ২৭০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। কয়লার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাজেট বাড়ানো হয়েছে; সার,

বিদ্যুৎ শক্তি, পেট্রোলিয়াম, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, পরিবহণ, সিমেণ্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। প্রতিরক্ষা খাতেও ব্যয়ের পরিমাণ ২১৫৭ কোটি টাকা থেকে ২২৭৪ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশগুলিকে সাহায্য করার জন্যে এবং রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন খাতে দান করার জন্যে ভারত এই বাজেটে ৪০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করে রেখেছে। এর থেকে ভূটান পাবে ১৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ ৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, নেপাল ৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং সিকিমকে দেওয়া হবে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ সালের শেষে ১৮৪৩৭ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭৫-৭৬ সালের শেষে ১৯৮২৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এই বাজেটে অভিনবত্ব যে কিছুই নেই সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সরকার প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ সুবিধা দিলেও দেশের ৮০ শতাংশেরও বেশি লোক তাতে উপকৃত হবে না; কারণ দেশের গরীব জনসাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ করের আওতায় আসে না।

অন্যদিকে পরোক্ষ করের বোঝা যেভাবে বাড়ানো হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের ওপরেও আরো বোঝার সৃষ্টি হবে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে এটা সহায়ক হবে না। আবার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়াবার যে চেষ্টা চলছে তা-ও যে খুব আশাপ্রদ তা নয়। উৎপাদন বাড়াবার যে প্রয়াস সরকার চালাচ্ছেন তাও খানিকটা প্রতিহত হবে পেট্রোলজাত জিনিস, টায়ার, সিমেণ্ট ও কয়েকটি ভোগ্যসামগ্রীর ওপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে। আগামী বছর ২৮৮ কোটি টাকার কর প্রস্তাবের প্রভাবেও ঘাটতি এড়ানো সম্ভব হবে না। খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে যে ভরতুকী দেওয়া হবে তার পরিমাণও কম নয়। সব মিলিয়ে দ্রব্য মূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভব হবে কি?

যদি শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ধারা জোরদার হয় তবেই মঙ্গল। কিন্তু শিল্প বিনিয়োগ পুনরুজ্জীবিত করার মত পরিবেশের সৃষ্টি এখনও হয়নি।

অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ বাজেট:

আগামী আর্থিক বছরের (১৯৭৫-৭৬) জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাজেট তৈরি করেছেন তার উল্লেখযোগ্য দিক হল, গত তেরো বছরে এই প্রথম একটি

উদ্বৃত্ত বাজেট রাজ্যসরকার উপহার দিলেন (১৯৬২-৬৩ সালে যখন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন সাড়ে একুশ লক্ষ টাকার একটা উদ্বৃত্ত বাজেট দেখতে পাওয়া গিয়েছিল)। আগামী বছরের জন্যে যে বাজেট তৈরি হয়েছে তাতে সাতাশ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে।

রাজ্য সরকার যদি ঘাটতি বাজেট তৈরি করেন তবে, সেই ঘাটতি পূরণের জন্যে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয় ঠিকই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যেমন ঘাটতি পূরণ করার জন্যে প্রয়োজন হলেই ট্রেজারী বিলের বিপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে টাকা ধার করতে পারেন এবং নতুন মুদ্রার সৃষ্টি করতে পারেন, রাজ্য সরকার তা পারেন না। অতিরিক্ত কর ধার্য করেও যদি রাজ্য-সরকার ঘাটতি এড়াতে না পারেন, তবে তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারেন ; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওভার ড্রাফটও নিয়ে থাকেন (কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকারগুলো এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওভার ড্রাফট নিতে পাচ্ছেন না)। তাছাড়া রাজ্য সরকারগুলোর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করার ক্ষেত্র খুবই সীমিত। আয়কর, সম্পদ কর, দান কর, মূলধন মুনাফা কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর ধার্য করে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয় কৃষিগত আয়কর এবং ভূমি রাজস্বের ওপর। আগামী বছরের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুতল বিশিষ্ট 'নতুন' বাড়ির ওপর সম্পদ কর ধার্য করার প্রস্তাব করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, সীমিত সম্পত্তির মধ্যে উদ্বৃত্ত বাজেট তৈরি করতে পারলে রাজ্য সরকারের পক্ষে ঝামেলা কম থাকে। কিন্তু সে জন্যে উদ্বৃত্ত বাজেট যে সর্বদা বাঞ্ছনীয় তা নয়। ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাজেট তৈরি করেছেন তা একটা উদ্বৃত্ত বাজেট হলেও তাতে নতুন শিল্প স্থাপনের কর্মসূচী অথবা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোন বড় রকমের বিনিয়োগে কর্মসূচী প্রস্তাবিত হয়নি। অথচ শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্য থেকে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে,—বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বেকারদের জন্যে কর্ম-সংস্থানের কতটা সুবিধা হবে এবং যদি তা হয় তাহলে কিভাবে হবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই।

অবশ্য অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৫০ কোটি টাকার পরিকল্পনা

গৃহীত হয়েছিল, ১৯৭৫-৭৬ সালে ১৭১ কোটি টাকার পরিকল্পনা গৃহীত হবে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা খাতে ১৫০ কোটি টাকা থেকে ১৭১ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ালেই যে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে তা মনে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল বাজেটে ১৯৭৫-৭৬ সালে রাজস্ব খাতে আয় হবে ৪৮৮ কোটি ২২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, ব্যয় হবে ৪৯৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। রাজস্বখাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। মূলধন খাতে ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের শেষে ঘাটতির পরিমাণ, যার মোট পরিমাণ হল ১০ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, যোগ করা হয় তবে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ সালে অতিরিক্ত ১২ কোটি টাকার কর এবং কেন্দ্রীয় করের অংশ বাবদ প্রাপ্য ১১ কোটি টাকা ধরে কর খাতে মোট আয় দাঁড়াচ্ছে ২৩ কোটি টাকা। সুতরাং বছরের শেষে বাজেটে ২৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াবে বলে অনুমিত হয়েছে।

এই ২৭ লক্ষ টাকা দিয়ে কি করা হবে সে সম্পর্কে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, সমাজের যে অংশ সর্বাধিক দরিদ্র অথচ উৎপাদনমূলক শক্তিতে ভরপুর, অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের যাঁরা ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, তাঁদের জন্যে এই অর্থের ব্যবহারই হবে সর্বোত্তম ব্যবস্থা।'

কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন, মাত্র ২৭ লক্ষ টাকায় তিনি অগণিত ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের অবস্থার কতটা উন্নতি করতে পারবেন?

বাজেটে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করার জন্যে আলাদা কোন ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা কি করা যেত না?

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশের অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ভূমিকা এবং এই রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে অপেক্ষাকৃত অল্প লগ্নীর প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনা করে জাতীয় স্বার্থেই এই রাজ্যকে অধিকতর পরিমাণে কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া উচিত। ভারত সরকার রপ্তানি বাবদ যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেন তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পশ্চিমবঙ্গের জিনিসের রপ্তানি থেকে আসে। দেশ বিভাগের পর থেকে যে সংকটের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্য যাচ্ছে তা মোচন করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যা-যা করা উচিত ছিল তার অনেক কিছুই করা

হয়নি। ভারতের সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় অর্জিত হয় পাট ও চা থেকে এবং এই দুটো সামগ্রীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবদান যে কত বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেই অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য এই রাজ্যের ভাগ্যে কমই জুটেছে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই রাজ্যের কর, শুল্ক ও অনুদান অংশ হিসাবে মোট ৮২২'৯৩ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। পূর্ববর্তী অর্থ কমিশনের সুপারিশ ছিল ৩৬৯'২৬ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশে অধিকতর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও বহুবিধ জটিল সমস্যায় আকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা-বহির্ভূত এবং পরিকল্পনা অঙ্গীভূত উভয় ক্ষেত্রেই বেশ বড় রকমের কেন্দ্রীয় সহায়তার প্রয়োজন থেকেই যাবে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশক্রমে তার যে প্রাপ্য অংশ পেয়েছে সেই অজুহাতে এই রাজ্যকে পরিকল্পনাখাতে অধিকতর সাহায্য লাভের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। পশ্চিমবঙ্গ যে শুধু কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তাই নয়—বৃহত্তর কলকাতার নাগরিক জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা আছে সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতের আর কোন সহরে এত সমস্যা নেই। কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন-গতি এত শ্লথ হয়েছে যে একটি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলা কালে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যতটা আর্থিক আনুকূল্য পাওয়া উচিত ছিল ঠিক ততটা পাওয়া যায়নি।

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে যে অতিরিক্ত করের ব্যবস্থা হয়েছে তার আওতায় আসছে বহুতল নতুন বাড়ির ওপর নতুন সম্পদ কর, বাতানুকূল হোটেল-রেষ্টুরেন্টের বিলাস ব্যবস্থার ওপর কর, মদের ওপর শুল্ক, কারপেট-ইলেকট্রো-ম্যাগনেট টেপের ওপর বিক্রয় কর এবং বেশি স্থাবর সম্পত্তি লেনদেনের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প শুল্কের হার বৃদ্ধি।

কিছু কুটির ও ভেষজ শিল্পকে সুবিধা ও উৎসাহ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতকারক ও উৎপাদকদের বিক্রয় কর দেওয়ার ক্ষেত্রে করযোগ্য কারবারের সীমা দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা করার প্রস্তাব বাজেটে আছে। তাছাড়া রান্না করা খাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কর রেহাইয়ের সীমা দুটাকা থেকে দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা করা হবে। নতুন স্থাপিত ছোট শিল্পগুলোকে প্রথম বিক্রয়ের

তারিখ থেকে তিন বছর কাল প্রথম স্তরের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করমুক্ত করার জন্যে আইন হবে; ভেষজ শিল্পের সুবিধার জন্যে বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় শোধিত স্পিরিট আমদানীকে প্রবেশ কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে; এবং বিশুদ্ধ রেশমী সূতা তৈরিকে করমুক্ত করা হবে (কর ধার্য ও কর রেহাইয়ের প্রস্তাবগুলো নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য)।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে, ১৯৭৪ সালে এই রাজ্যের জন্যে ১৯৯টি লাইসেন্স দেওয়া হয়। শুধু লাইসেন্স কতগুলো দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে শিল্পোন্নয়নের গতি বিচার করা চলে না। গত বছর রাজ্যে শিল্প-উৎপাদন কতটা বেড়েছে এবং এই রাজ্য থেকে মূলধন অন্য রাজ্যে চলে গেছে কি না সে বিষয়ে অর্থমন্ত্রী কিন্তু কিছুই বলেন নি।

লনা আর আমি যখন শেয়ালদায় ট্রেন থেকে নামলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। লনা খুব খুশি। আমারও মন্দ লাগেনি আজকের ভ্রমণ। আমরা দুজনে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলাম। লনার ইচ্ছা ছিল আরো দূরে যেতে।

বাণী আর আমার একবার ইচ্ছা হয়েছিল, আমরা বকখালি যাব ভেবেছিলাম। কি একটা কারণে যেন শেষ পর্যন্ত আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। আজ কিছু দূর ঘুরে এলাম।

আমরা সকালেই পৌঁছেছিলাম। তখনও আড়তগুলোতে মাছ ওজন চলছিল। লনা দেখে খুশি।

দোকানে চা জলখাবার খেয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরেছিলাম। নীল জল। লনার আনন্দ দেখে কে! ওর আনন্দ দেখে আমারও আনন্দ হয়েছিল।

লনা বলেছিল, 'বড় সুন্দর, না ছোটকা?'

মৃদু হেসে বলেছিলাম, 'সত্যি সুন্দর।'

সমুদ্রের ধারে-ধারে বক-গাঙচিল আর শালিখের ঝাঁক দেখে অবাক হয়েছিল লনা। তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতেই বলেছিল, 'পাখির জীবন খুব সুন্দর না ছোটকা।'

লনা কি বলতে চায় বুঝতে পেরেছিলাম। চুপ করে ছিলাম। শুধু শুনছিলাম ওর কথা।

অনেকক্ষণ পরে, তখন আমরা চুপ করে বসে আছি। লনার দৃষ্টি সমুদ্রে

বিস্তৃত। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমার খুব কষ্ট না ছোটকা?'

কথাটা কানে যেতে একটু চমকেছিলাম। বলেছিলাম, 'কষ্ট কিসের?'

ও বলেছিল, 'আমি জানি।'

আমি চুপ করে ছিলাম।

আরো একটু চুপ করে থেকে লনা বলেছিল, 'আমার কিন্তু মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগে।'

—'কি খারাপ লাগে তোর?' জানতে চেয়েছিলাম আমি।

—'তোমার ব্যাপারে কতজনে কত কথা বলে।'

—'বললেই বা।'

—'বলবে কেন?' লনা যেন ফুঁসে উঠেছিল। 'যা সত্যি নয়, না জেনে, কেন বলবে তারা!' একটু চুপ করেছিল লনা। আমার দিকে চেয়েছিল। চেয়ে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। মৃদুকণ্ঠে ডেকেছিল, 'ছোটকা!'

—'কি রে?' সাড়া দিতে হয়েছিল আমাকে।

—'আমাকে সত্যি বলবে তুমি?'

—'কি বলবো?'

—'এই যে—তোমাকে...' একটু থতমত খেয়েছিল মেয়েটা। কষ্ট হয়েছিল ওর। বলেছিল, 'তোমাকে যে ধরে নিয়ে গেল। মানে তুমি যে কতদিন... কেন ছোটকা?'

ওইটুকু মেয়ের মুখে কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে আমি শিউরে উঠেছিলাম। একটা হিম শীতল স্রোত বয়ে গিয়েছিল আমার ঘাড়ের কাছে। আমি যেন ভয় পেয়েছিলাম।

ও ডেকেছিল, 'ছোটকা!'

আমি ওর চোখের মুখের দিকে চাইতে পারিনি। ভেবে পাইনি কি উত্তর দেব। কিন্তু উত্তর আমাকে দিতেই হবে।

ওর ডাকটা আমার কানে এসেছিল, 'ছোটকা!'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। ওকে দেখছিলাম, মৃদুকণ্ঠে বলেছিলাম, 'কারণ একটা নিশ্চয়ই ছিল লনা।'

দেখতে পেয়েছিলাম আমার উত্তরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে উঠল।

বলেছিলাম, 'কিন্তু কেন আমাকে ধরেছিল অনেক চিন্তা করেও আমি ভেবে পাইনি।'

—'তাহলে…' কিছু বলতে চেয়েছিল ও।

মৃদু হাসি ফুটেছিল আমার মুখে। বলেছিলাম, 'আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ আমি জানতাম না।'

—'তাহলে তোমাকে ধরেছিল কেন?'

—'সেটাই আমি আজও ভেবে পাই না, লনা। কোথাও একটা ভুল নিশ্চয়ই হয়েছিল। কোথায়? সেটাই খুঁজছি।'

কথাগুলো বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলাম, সমুদ্রকে দেখছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আমার প্রসারিত হাতের ওপর একটা স্পর্শ অনুভব করেছিলাম। লনার শীর্ণ হাত আমার একটা হাত ধরে ছিল। মৃদু কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেয়েছিলাম, 'তুমি আর ভেব না ছোটকা।'

ভাবতে আমি চাই না। মন ভাবায়। কেন এমন হোল?

দুপুরে হোটেলে খেয়েছিলাম আমরা। খুবই সাধারণ খাওয়া। পয়সা দিতে গিয়ে চমকেছিলাম। এখানে খেতে গেলে সহর কলকাতার চেয়ে পয়সা বেশি লাগে। হোটেলওয়ালা বলেছিল, 'দাদা, ভাল আছেন আপনারাই। রেশন পান চলে যায়। গ্রামের ভেতরে খেটেখাওয়া মানুষদের দেখলে চোখে জল আসে। বউ-ঝির দল পুকুরে নেমে পড়ে গুগলি ঝিনুকের জন্যে। ভাতের বদলে কিছু তো দিতে হবে পেটে।'

কথাটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সহরে আছি আমরা। সপ্তাহের রেশন পাই। চালের বিকল্প হিসাবে গমও জোটে। আছে বাঁধা মাইনের চাকরী। কিন্তু গ্রামের খেটেখাওয়া মানুষগুলোর? এখন কাজ নেই, কিন্তু পেট শুনবে কেন?

ফেরার পথে খুশিতে ভরপুর লনা আবার জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। সেই আবার পথের পরিচিত ছবি। তবু ওর ভাল লেগেছিল আবার।

আর আমি? আমার মনে হাজার চিন্তা। বাইরের ধু-ধু মাঠ আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল। মৌসুমী বায়ুর এখনও অনেক দেরি। বর্ষা কি ভাবে আসবে কে জানে। বর্ষা না এলে এ মাঠ রিক্তই থেকে যাবে। এখন যে হাহাকার তা আরো চরমে উঠবে। চিরপরিচিত কালোবাজারী আরো ভয়াবহ হবে। ক্ষুধার জ্বালা মানুষ সহ্য করবে কোন শক্তিতে।

যদিও অনেক কথাই শোনা গিয়েছে। আমরা সর্ব বিষয়ে কতখানি স্বাবলম্বী

হয়েছি তার কথা আমরা জেনেছি। সবুজ বিপ্লব আমাদের খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে দিয়ে গেছে। তবু আমাদের খাদ্য আমদানী করতে হয়। মৌসুমী বায়ুর ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়।

মনে পড়ে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার কথা। কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের খাতে প্রথম যোজনায় ২৪১ কোটি টাকার একটা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। পতিত জমি উদ্ধার, মাটি সংরক্ষণ কর্মসূচী, সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রথম যোজনায় হয়েছিল। সামগ্রিক ভাবে প্রথম পাঁচশালা যোজনায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সন্তোষজনক হারে বেড়েছিল।

১৯৪৯-৫০ সালের কৃষি উৎপাদন সূচী ১০০ ধরলে ১৯৫০-৫১ সালে, অর্থাৎ, প্রথম বছরে কৃষি উৎপাদন সূচী ছিল ৯৬, এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে যোজনার শেষ বছরে হয়েছিল ১১৫ ; খাদ্যশস্যের উৎপাদনও ৫৪.৯ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ৬৬.৯ মিলিয়ন টন দাঁড়িয়েছিল। তৈল বীজ ও কার্পাসের উৎপাদনও বেড়ে ছিল। অবশ্য পাট ও চিনির উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বাড়লেও যোজনার লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী বাড়েনি। প্রথম পাঁচশালা যোজনায় ৮.৫ মিলিয়ন একর জমি জল সেচের সুবিধা পেয়েছিল, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম ছিল।

দ্বিতীয় পাঁচশালা যোজনায় গুরুভার ও মূল শিল্পের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল (কিছুদিন আগে, গায়ত্রী প্রসন্ন আর আমার সেই দিনগুলোতে ; গায়ত্রী প্রসন্ন প্রায়ই বলতেন, আমাদের দেশ শিল্পে স্বয়ম্ভর হয়েছে বলে বড় গর্ব আমাদের। কিন্তু আমার মনে হয় সত্য সত্যই তা নয়। আমার আশঙ্কা, যদিও আমার এই আশঙ্কাটা মিথ্যা প্রমাণিত হলে সব চেয়ে বেশি খুশি হব আমি। আমার আশঙ্কা হয়, একদিন হয়তো এমন দিন আসতে পারে, আমাদের শিল্প—সেই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের দল ক্রমশ বেকার হচ্ছে। যদিও আমি চাই আমাদের শিল্প এগিয়ে চলুক। আর সেই দেশের স্বার্থে—জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত সম্পদ রাজনীতিমুক্ত হোক, রাজনীতির নামে নোংরামী শুধু অন্যায় নয়, অমার্জনীয় অপরাধ। অবশ্য সামগ্রিকভাবে কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম যোজনার চেয়ে বেশি ছিল।

প্রথম যোজনায় কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল ১৮ শতাংশ, দ্বিতীয় যোজনায় ১৬ শতাংশ। যদিও ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। তবুও যোজনার শেষ বছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন

হয়েছিল ৮২ মিলিয়ন টন। ইক্ষু, পাট, তৈলবীজ কার্পাসের উৎপাদন বেড়েছিল কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা থেকে তা অনেক পিছনে ছিল।

এক দশকে, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সাল থেকে সুরু করে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত জল সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা ৫১.৫ মিলিয়ন একর থেকে ৭০ মিলিয়ন একর পর্যন্ত বেড়েছিল। তবু বলতে হয় দ্বিতীয় যোজনায় কৃষি-ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। যদিও বহু অসুবিধার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হয়েছিল এবং খাদ্য শস্যের আমদানীর দরুণ অনেকটা বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতা তৃতীয় যোজনায়। দ্বিতীয় যোজনার শেষে খাদ্য শস্যের উৎপাদন যেখানে হয়েছিল ৮২ মিলিয়ন টন, তৃতীয় যোজনার শেষে ৮২.৩ মিলিয়ন টন। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও অবস্থা শোচনীয় ছিল।

অথচ ১৯৬৪-৬৫ সালে, যোজনার চতুর্থ বছরে উৎপাদন হয়েছিল ৮৮.৪ মিলিয়ন টন। তার পরের বছর উৎপাদন কমে ৭২.৩ মিলিয়ন টন। কৃষি-উৎপাদনসূচী ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ১৪০.৫ (১৯৪৯-৫০ = ১০০) এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ছিল ১৫০, কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদন খুবই কমে যায়।

এই অবস্থার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় দেশে খুব ভাল বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং প্রয়োজনের সময় জমিতে প্রচুর জল সরবরাহ ছিল ; কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে অনাবৃষ্টি ও খরার দরুণ জমিতে ভাল ফসল হয়নি। কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্যে যে ত্রিমুখী কর্মসূচী দরকার, অর্থাৎ, উচ্চ ফলনশীল বীজ ও চারা রোপণ, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ ও জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল সেচের ব্যবস্থা করা, তাব কোনটাই তৃতীয় যোজনায় হয়নি। তার ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়ার পরিবর্তে ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল।

১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্যশস্যের ঘাটতি এত তীব্র হয়েছিল যে, বিহারের কিছু অংশে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং দেশের বহু অংশ দুস্থ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

কৃষিক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীলতার পথে পদক্ষেপ সুরু হয় ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে। ওই বছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয় ৯৫.১ মিলিয়ন টন এবং তারপর থেকেই শুধু খাদ্যশস্যের উৎপাদনই নয়, সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান হার পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ যোজনার তিন বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে

যথাক্রমে ৯৯.৫ মিলিয়ন টন, ১০৭.৮ মিলিয়ন টন ও ১০৫ মিলিয়ন টন। কিন্তু ১৯৭২-৭৩ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০০ মিলিয়ন টন অনুমিত হয়। খাদ্য-শস্যের উৎপাদন হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণ সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়া। সমগ্র দেশ খরা পরিস্থিতির আওতায় আসায় কৃষি উৎপাদন কমেছে। চতুর্থ যোজনার চার বছরে গড়ে পাঁচ শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়নি।

পঞ্চম যোজনার এক বছর পূর্ণ হয়েছে (৩১. ৩. ১৯৭৫), সুরু হয়েছে দ্বিতীয় বছর। ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট যোজনার দ্বিতীয় বছরের জন্যে ৫৯৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হল ৩১৫৪ কোটি টাকা; রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র শাসিত এলাকার অংশ হল ২৮০৬ কোটি টাকা।) ১৯৭৪-৭৫ সালের তুলনায় ১০৭৫-৭৬ সালে ১১:৬ কোটি টাকা বেশি। কিন্তু যোজনার চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়নি। ১৯৭৫-৭৬ সালের যোজনায় আর্থিক সম্পদের যে ফাঁক থেকে যাবে তার পরিমাণ ৪৬৪ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬২৫ কোটি টাকা। মুদ্রাস্ফীতির যে তীব্ররূপ গত দু বছরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা পঞ্চম পাঁচশালা যোজনা কার্যকরী হবার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে (যে সব তথ্যের ভিত্তিতে ও যে মূল্যস্তরের ভিত্তিতে যোজনার খসড়া তৈরি হয়েছে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন করে খসড়া যোজনাটিকে ঢেলে সাজানো দরকার। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার এখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি এবং তার ফলে যোজনার কাজ যে ভাবে এগুচ্ছে তা আদৌ সন্তোষজনক নয়)।

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যোজনা খাতে ৩১৫৪ কোটি টাকার যে বরাদ্দ করেছেন তাতে অতিরিক্ত বাজেট সম্পদের পরিমাণ হল ৫৯৬ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ২৫৫৮ কোটি টাকা খরচ হবে কেন্দ্রীয় যোজনা খাতে এবং তা হবে এভাবে :

সাধারণ সেবাস্রোত বাবদ ৯ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৮ কোটি টাকা)।

সামাজিক এবং সমষ্টিগত সেবা বাবদ ৩৫৫ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৩৫২ কোটি টাকা)।

সাধারণ অর্থনৈতিক সেবামূলক কাজ বাবদ ৪৯ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫

সালে ছিল ৩৮ কোটি টাকা)।

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কাজ বাবদ ২২৭ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ২১৬ কোটি টাকা)।

শিল্প ও খনি বাবদ ১২২১ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৭২৯ কোটি টাকা)।

জল ও শক্তি উন্নয়ন বাবদ ১১৭ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৯৯ কোটি টাকা)।

পরিবহণ ও যোগাযোগ বাবদ ৫৮০ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৬১৩ কোটি টাকা)।

সাধারণ অর্থ নৈতিক সেবামূলক কাজের ভেতর কৃষি-সমবায় ও সমবায়-মূলক সার তৈরির কারখানা বাবদ যে ৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে ৪৯ কোটি টাকা ওই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। অপর দিকে জল ও শক্তি উন্নয়ন বাবদ যে ১১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে রাজ্য যোজনাগুলোকে কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে Rural Electrification Corporation-কে যে ৪০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে তা ধরা হয়নি। পঞ্চম যোজনার প্রথম বছরে কেন্দ্রীয় যোজনার ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২০৫৫ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় বাজেটে যোজনা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ যেমনি অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তেমনি যোজনা বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে যোজনা খাতে বহির্ভূত ব্যয়ও অনেক ক্ষেত্রেই দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে।

১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে খাদ্য সামগ্রী ও শক্তি এই দুটি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষি খাতে সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৩ কোটি টাকা থেকে ২৭০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে সার উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ যেখানে ১৯২ কোটি টাকা সেক্ষেত্রে ১৯৭৫-৭৬ সালের বিনিয়োগ আরও ৮৪ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। কয়লা শিল্প বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের ১৪১ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে ২২৯ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

যদিও পঞ্চম যোজনার দ্বিতীয় বছরেও প্রথম বছরের সব সমস্যাই

দেখা যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা তো আছেই; তাছাড়া আছে বেকার সমস্যা। খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে আমদানী রপ্তানির ফাঁক খুবই বেশি। এ সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করার জন্যে যেভাবে পঞ্চম যোজনাকে ঢেলে সাজানো উচিত তা করা হয়নি (শুধু একটা আর্থিক বছরে কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ হল সেটার মাপকাঠি করে যোজনার মূল্যায়ন করা চলে না।)

সম্প্রতি শিল্প ক্ষেত্রে যে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সরকার তা স্বীকার করেন না। সরকারের মতে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্যে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার প্রভাবেই জিনিসপত্রের দাম ডিসেম্বর মাসের তুলনায় জানুয়ারী (১৯৭৫) মাসে কিছুটা কমেছে। মুদ্রাস্ফীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে গেলে সাধারণ মানুষের (যাদের হাতে বর্ধিত ক্রয়শক্তির পরিমাণ খুব বেশি নয়) চাহিদা চূড়ান্ত পর্যায়ে বাড়তে পারে না। সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর জন্যে সাধারণ মানুষের চাহিদাও প্রতিহত হয়। এভাবে যে ক্রেতা-প্রতিরোধের সৃষ্টি হয় তার ফলে জিনিসপত্রের দাম খানিকটা কমে। দেশে জিনিসপত্রের দাম যা কমেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তা খুবই সামান্য। ১৯৬১-৬২ সালের গড় পাইকারী মূল্যসূচী ১০০ ধরলে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই মূল্যসূচী ছিল ৩২৮.২; ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী কমে দাঁড়ায় ৩১৪.৭; এখনও মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা যথেষ্ট বেশি।

এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যে যে জিনিসটার খুবই প্রয়োজন তা হলো উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু সম্প্রতি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের যে ক্রমহ্রাসমান ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে ভোগ-সামগ্রী শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে যে সক্রিয় প্রচেষ্টা সরকারের দিক থেকে আশা করা হয়েছিল, ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে তা আশানুরূপ পরিলক্ষিত হয়নি। আবার যোজনা খাতে যে অর্থব্যয় হবে তার সংস্থান করার জন্যে সরকারকে আবার ঘাটতি অর্থসংস্থানের আশ্রয় নিতে হবে। তাতে দেশের মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আসা সম্ভব হবে না।

কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন। কিন্তু কৃষিজাত উৎপাদন বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সুষ্ঠু বণ্টন এবং ন্যায্য দাম নির্ধারণের জন্যে কি সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সে সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলেন নি।

দেশে সবুজ বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু তবুও দেশের কৃষিব্যবস্থা আজও

বৃষ্টিনির্ভর। সারের বণ্টনে অব্যবস্থা, চোরা কারবারী। খাদ্য আমদানী করে সহরের রেশন ব্যবস্থা অর্থাৎ সহরের লোককে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। গ্রামের আংশিক রেশন নামে মাত্র—ভূমিহীন খেটে খাওয়া মানুষদের জন্মে কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার বিরাট অংশ কালোবাজারীদের মুখাপেক্ষী হয়ে দিন কাটাচ্ছে। সবুজ বিপ্লব—খাদ্যশস্যের রেকর্ড ফলন, যাই হোক না কেন তাদের কিছু যায় আসে না। পয়সা জুটলে কিনে খায় যে দামেই হোক, না জুটলে অখাদ্য খেতে বাধ্য হয়, কারণ পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা !

বাড়ি ফিরে দেখলাম সেজদা এসেছে টাটা থেকে। আর দেখলাম ননা বা আমার জন্মে বাড়িতে কোন রকম উদ্বেগ-উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই। আমরা সেই কোন ভোরে বেরিয়েছি, বাড়ির সকলে তখনও ঘুমিয়ে, চিন্তা করাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু কেউ একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করল না।

সারাদিন স্নান হয়নি, স্নান করে নিলাম। বড় বউদি চা জলখাবার দিয়ে গেল। কথা বলল। অতি সাধারণ কথা। রোজ যেমন বলে। বেশি নয় দু চারটে। আমিও সাধ্যমত জবাব দিলাম। কখনও চুপ করে রইলাম।

আমি চুপ করে গেলে আর কেউ কথা বলে না। হয়তো ভয় পায়। কারণ দু'চার বার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে ইতিপূর্বে। অসহ্য বোধ হয়েছে অন্যের কথা বলা। চিৎকার করে উঠেছি। সেই থেকেই সকলে সাবধান হয়েছে। মেজদা কখনো-সখনো দু'চারটে কথা বলে। মেজ বউদি আমার সামনেই প্রায় আসে না। মা আমাকে ত্যাগ করেছে। যদিও খুব বেশি দিন আমি মায়ের স্নেহ পাইনি। ন'দা কাগজ অথবা বইপত্র এনে দেয়। ওর বউটা সামনে পড়ে গেলে শুধু হাসে। চোখে আতঙ্কের ছায়া। ওদের বাচ্চা মেয়েটাকে আমি খুবই ভাল বাসতাম এক সময়। খুব সুন্দর তুল-তুলে দেখতে ছিল। টক টকে রঙ। একমাথা চুল। ছোট ছোট চোখ। খুব হাসতো। বাড়ি ফিরে দেখেছিলাম মেয়েটা মরে গেছে। কি একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সে সময় ডাক্তারদের ধর্মঘট চলছে। তবু ভর্তি করাতে পেরেছিল, কিন্তু চিকিৎসা হয়নি ঠিকমত।

বড় বউদিই বলতে গেলে আমাকে দেখাশোনা করে। আমার ওপর নজর

রাখে। আর নজর রাখে বলে ওষুধ ফেলে দেওয়া ধরে ফেলেছিল একদিন। তাছাড়া আমি যখন খুবই ছোট, বড় বউদি আমাদের সংসারে আসে। আমাকে দেখাশোনা করছে কমদিন নয়।

বড় বউদি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সকাল-সকাল খাবে?'

—'কেন?'

—'যদি খাও।'

বললাম, 'রোজ যেমন খাই, তেমনি খাব।'

আজও আমি অনেক রাতে খাব। সকলে যখন শুয়ে পড়বে। বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে যাবে আমার। তখন খেয়েই শুয়ে পড়বো। ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করবো সঙ্গে সঙ্গে।

সখ করে কটা সিগারেট কিনেছিলাম। চা খেয়ে ধরালাম একটা। সেজদা ঘরে এল সিগারেটটা ফেলে দেওয়ার পরেই। বলল, 'কতদূর ঘুরে এলি? কেমন বেড়ালি?'

বললাম, 'ভালই।'

—'একটা দিন আগে এলে আমি কিন্তু যেতাম তোদের সঙ্গে। নিয়ে যেতিস?'

—'কেন নয়?' বললাম আমি, 'তবে আমিও জানতাম না বেড়াতে যাওয়ার কথা।'

—'বলিস কি?' একটু যেন আশ্চর্য হল সেজদা।

বললাম, 'ভোর বেলা ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে গেল লনা।'

—'অথচ আগে থেকে বড় বউদিকে বলা ছিল।'

—'সে কি!'

—'তাইতো শুনলাম এসে। রাতে এক সঙ্গে শোয়। ভোরবেলা জেঠিমাকে ডেকে দিতে বলেছিল।'

কথাটা শুনে একটু গম্ভীর হলাম। আমাকে নিয়ে প্ল্যান করেছিল মেয়েটা। কিন্তু রাগ করতে পারলাম না। ওর বাবা-মার মত বড় বেশি হিসাবী মন ওর নয়। মেয়েটা অনেক সোজা এবং সরল, যদিও এ বয়সে অনেক কিছু জেনেছে—উপলব্ধি করেছে। ওর মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং বেশ কিছুটা স্পষ্টবাদীতা ও দৃঢ়তা আছে ওর চরিত্রে।

সেজদা বলল, 'কিরে গম্ভীর হলি যে?'

হেসে ফেললাম। বললাম, 'ওই শয়তানটার কথা ভেবে। খুব পেকেছে ও।'

সেজদাও হাসল। বলল, 'রাগ করলি নাকি ওর ওপর?'

বললাম, 'রাগ করতে আমি ভুলে গেছি। শোন, এক কাজ করা যাক. চল কাল কোথাও থেকে ঘুরে আসি আমরা।'

—'কিন্তু কাল যে আমাকে ফিরে যেতে হবে। অবশ্য রাত্রে যাব।'

—'দুদিনের জন্যে এসেছো?'

—'হ্যারে।'

—'হঠাৎ?'

আমার প্রশ্নে সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না সেজদা। প্রথমটা ধরা-পড়া ভাব। একটু হাসল। বলল, 'এমনি এলাম একবার। তোর সঙ্গে কিছু কথাও আছে আমার।'

—'আমার সঙ্গে কথা! কি কথা?'

—'মানে তোর সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম আমি। তোকে তো কিছু করতে হবে।'

—'ওঃ!' গম্ভীর হলাম আমি।

সেজদা তাড়াতাড়ি বলল, 'রুদ্র, আমি কিন্তু সে ভাবে কথাটা বলছি না। আমি তোর ফিউচারের কথাটাই চিন্তা করছি। সত্যি কথা বলতে কি চাকরী পাওয়া কষ্টকর হবে তোর পক্ষে। অবশ্য তেমন ব্যবস্থা যদি কিছু করা যায় তাহলে কিছুই আটকায় না। আমি মেজদা অনেক চেষ্টা করেছি, তোর চাকরীটা বাঁচানো সম্ভব হয়নি। আসলে সোর্স নেই। তাছাড়া……'

সেজদা চুপ করে গেল। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। শুনেছি আমার চাকরীটা বাঁচানোর জন্যে আমার দাদাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সম্ভব হয় নি। বললাম, 'কি করতে বল আমাকে?'

—'একটা কিছু করতে তো হবে তোকে।' বলল সেজদা।

বললাম, 'সে কথাটা আমিও ভাবছি।'

সেজদা যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, 'আমি কিছু ব্যবস্থা করবো?'

—'তুমি কী ব্যবস্থা করবে?' জানতে চাইলাম।

—'তুই যদি বলিস আমি চেষ্টা করি।'

বললাম, 'করো।'

আমার সম্মতি পেয়ে সেজদা যেন স্থির হল। সিগারেট ধরাল। নীরবে

কটা টান দিয়ে গলাটা অকারণে পরিষ্কার করে নিয়ে কথা বলল আবার, 'বাণী আজ এসেছিল। ওর সঙ্গেও কথা বললাম।

আমি চুপ করে রইলাম।

সেজদা বলল, 'বাণী খুবই সিরিয়াস প্রকৃতির মেয়ে। সংবেদনশীল।

আমি তবু চুপ।

এ সময়ে সেজদা উঠল। বলল, 'আমি একটু বাইরে যাব। চলি। কাল সকালে আবার কথা হবে।'

সেজদা চলে গেল। বসে রইলাম আমি। কিছু চিন্তার ঢেউ এগিয়ে আসতে চাইল—আমি আসতে দিলাম না। গায়ত্রী প্রসন্নের কথা জোর করে মনে করলাম। তাঁর প্রয়োজনটা উপলব্ধি করতে চাইলাম। মনে হল তিনি থাকতে হয়তো এমন অবস্থা আমার নাও হতে পারতো। যদিও আজকের সব কিছুর থেকেই তিনি দূরে চলে গিয়েছিলেন, তবু অনেকের কাছে তাঁর মূল্য একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাঁর পরিচয়ের ব্যাপ্তি বড় কম ছিল না।

আবার মনে হল, এ বরং ভালই হয়েছে। তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ানোর সমস্যা থেকে আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি। আমার জন্যে অপমানীত হয়েছিলেন তিনি। সেজদা তাকে নিবৃত্ত করেছিল। কারো কাছে যেতে দেয়নি আর।

রাতে সেজদার বিছানা হল আমার ঘরেই। রাত কত হবে—বোধ হয় বারোটা বেজে গেছে। সেজদার কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেলাম, 'রুদ্র ঘুমালি?'

'না, ঘুমাইনি আমি। এখন আমার রাত্রে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়। অনেক দিন ভোরের আলো দেখতে পাই নি। আগে এমন ছিল না। রাত দশটা এগারোটার মধ্যে শুয়ে পড়তাম। বাণীর কথা ভাবতাম। অনেক ছোট-খাটো টুকরো স্মৃতি। কত মান-অভিমানের কথা। কখন ঘুমিয়ে পড়তাম বুঝতেও পারতাম না। ঘুম ভাঙলে মনটা হালকা আর সুন্দর প্রশান্তিতে ভরে থাকতো।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বাণীর সঙ্গে কথা বলতাম। ঠিক ঘুমিয়ে নয়, ঘুমে জাগরণে। কারণ অনেক কথাই আমার কানে আসতো। জিজ্ঞাসা করতাম, 'বাণী তুমি কি করছো?'

—'ঘুমাচ্ছি।'

—'কেন?'

—'বারে, ঘুম পেলে ঘুমাবো না?'

—'আমার কথা ভাবনি?'

—'না, ঘুম পেলে কারো কথাই আমার ভাবতে ভাল লাগে না।'

—'আমার কথা?'

—'না, তোমার কথাও না।'

—'তোমার নিজের কথা?'

—'হ্যাঁ, আমার নিজের কথা আমি ভাবি বৈবি। সব সময়ই ভাবি। আরো অনেকের কথা ভাবি কখনো কখনো। কোন কোন দিন সকলের কথাও ভাবি। তোমার কথাও মনে হয়। অবশ্য খুব বেশি ভাবি না। তোমার সব কথাই জানি তো। জানি বলেই ভাবতে ভাল লাগে না আমার। যা জানি তা ভেবে কি লাভ বল?'

—'কিন্তু আমি যে সব সময় তোমার কথা ভাবি।'

—'আমার কথা?'

—'শুধু তোমার কথাই।'

—'তুমি স্বার্থপর।'

—'কেন?'

—'তুমি শুধু নিজের কথাই ভাব। যাকে বলে তুমি আত্মকেন্দ্রীক। নিজের গণ্ডিটুকুর বাইরে যেতে চাও না। বড় সাবধানী তুমি। কেন বলতো?'

—'সাবধান না হলে উপায় নেই যে?'

—'কিন্তু এর ফলে তুমি ছোট হয়ে যাচ্ছ না কি?'

—'আমার তো মনে হয় না। কারণ সাবধান হওয়ার অর্থ এই নয় আমি ক্রমশ স্বার্থপর হয়ে উঠছি। আমি নিজে ভাল থাকতে চাই। যেমন আমি নিজে এবং আমার পরিধির মধ্যে যারা তাদেরও ভাল করতে চাই, তারা যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা সব সময়েই করি আমি। যদিও আমার পরিধি খুবই ছোট এবং আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সদা সচেতন।'

হয়তো এ ছিল আমার এক ধরনের ছেলেমানুষী খেলা। তবু বড় ভাল লাগতো। খেলা হলেও বড় সুন্দর খেলা ছিল। বাণীর বকলমে নিজের সঙ্গেই নিজে খেলতাম আমি! আমার দোষ ত্রুটির বিচার করতাম। অন্যের ত্রুটি দেখা, সমালোচনা করার আগে নিজের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিতাম। পারতপক্ষে অন্যের সমালোচনা কখনো করতাম না।

এখন সে খেলা ভুলে গেছি। দীর্ঘ দিনের কারাবাস। জঘন্য অত্যাচার আমার অনেক কিছুই এলোমেলো করে দিয়েছে। আমার বিচার হয়নি। বিনা বিচারের আমি জানতেও পারলাম না কেন আমাকে জেলে পোরা হয়েছিল।

এখন নাকি সবই সম্ভব। সবই হচ্ছে। দেশের কথা চিন্তা করেই আইন আজকের। না হলে দেশ নাকি রসাতলে যাবে। অতএব কঠোর আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োজন। সেই জন্যেই আইন হয়েছে—হয়। প্রয়োগ চলে। যেমন আমার ওপর চলেছিল। যেমন চলতি কথা দাঁড়িয়ে গিয়েছে, বিনা ঘুষে কিছু হয় না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হত কথাটা। আমার ব্যাপারে প্রমাণীত হয়ে গেল। মাত্র কয়েক হাজার টাকায় ছাড়পত্র! জানাশোনা থাকলে সময়টা একটু কম লাগতো এই যা।

গায়ত্রী প্রসন্ন বলতেন, '...The elected kind of Government is superior to the non-elected...the legislator, or the primary and proper efficient cause of the law, is the people or the whole body of citizens, or the weightier part thereof, through its election of will expressed by words in the general assembly of the citizens...The authority to make the law belongs only to those men whose making of it will cause the law to be better observed or observed at all. Only the whole body of the citizens are such men. To them, therefore, belongs the authority to make the law."

আইন নয় টাকার খেলা। টাকার খেলায় সবই সম্ভব। চোর জোচ্চোর কালোবাজারী জেলে পায় জামাই আদর। প্লেনে চড়ে। মরে রাজনীতিকরা, কর্মী-নেতার দল। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব! প্রয়োজন শুধু রূপচাঁদ-পক্ষীর। সেটাই আসল। মানদণ্ড।

সেজদা ঘুমায়নি। এক সময় ঘুমকাতুরে বলে ওর বদনাম ছিল। যেখানে-সেখানে, শুয়ে বসে, যেভাবেই হোক না কেন ঘুমিয়ে পড়তো। আজ ওর চোখে ঘুম নেই। এখন ও ঘুমাতে পারে না।

ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। সত্যই ও দুঃখী। মূলে অর্থ। সেদিন টাকা ছিল না ওর।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

স্বপ্ন দেখলাম।

প্রথমটা চিনতে পারিনি। আমার সামনে এসে দাঁড়াতে চোখ দুটো ঝলসে গেল আমার। অত রূপ। অত সুন্দর দেখতে। ঠিক যেন কুমারটুলির শিল্পীর হাতে গড়া প্রতিমা। কিন্তু হাসবার সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারলাম—চিনতে পারলাম।

—'পরীদি তুমি!'

—'আমাকে চিনতে পারিসনি তো?'

—'তুমি কোথা থেকে এলে?'

—'তোকে দেখতে এলাম।'

—'কোথায় ছিলে তুমি?'

—'আমি আছি। তুই কেমন আছিস?'

—'ভাল।'

পরীদি আবার হাসল। বলল, 'কিছু একটা কর। এভাবে পড়ে থাকলে মরে যাবি যে।'

—'কি করবো বলতো?'

—'কেন অনেক কিছুই তো করার রয়েছে। কত কিছুই তো করতে পারিস। কিছু যদি না পাস, আমার ভাই শোভনের মত হয়ে যা না। শোভন আজ কত বড় হয়েছে। কত নাম ওর। ওর একটা কথার অপেক্ষায় কত কান খাড়া হয়ে আছে। ওর জন্যে হেন কাজ করতে পারে না খুব কম ছেলে আছে আমাদের বাড়ির কাছে।'

—'শোভন আজ কি হয়েছে পরীদি?'

—'ও অনেক বড় হয়েছে।'

—'কি রকম বড়?'

পরীদি চুপ। আবার জিজ্ঞাসা করলাম আমি। জানার জন্যে চিৎকার করে উঠলাম। পরীদি হাসছে। ঘুমটা ভেঙ্গে গেল আমার।

সেজদা ঘুমাচ্ছে। হতভাগা। পুরানো পাড়ায় প্রতিবেশী ছিলাম আমরা। পরীদিদের সঙ্গে জানাশোনা ছিল আমাদের। ওদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। শোভন আমার বন্ধু ছিল। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে ঢুকেছিলাম আমি। শোভন তার অনেক আগেই পড়াশোনা ছেড়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নিজের হাত খরচ নিজে চালাতে শিখেছে।

বছর আটেক আগের কথা। সেজদা সামান্য একটা কাজ করছে। পরীদি আর সেজদার ব্যাপারটা তখনও জানাজানি হয়নি। হঠাৎ জানাজানি হল। বিরাট আকার নিল। শোভনের বাবা আর শোভন সেজদাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। কিছু দিন পরেই শোভনদের ভাড়াটে বাড়ির ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা হল।...বিয়ের সানাই বাজল। পরীদির বিয়ে। বিয়ের আগে

পরীদিকে এ ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটরে নিউ মারকেটের কাছে দেখেছি। সঙ্গে পরীদির পরের বোনটাও ছিল। যাকে আবার পরীদির চেয়েও আগুন দেখতে। যদিও তখন ফ্রক পরা না চললেও পরে। ভদ্রলোককে চিনতে পারিনি। বছর ছু-আড়াই আগে পরীদির ছোট বোনটার সঙ্গেই নাকি ভদ্রলোকের বিয়ে হয়েছে।

হ্যাঁ, সেদিন বিকালেই ঝড়টা উঠেছিল। সকালের সানাই বিকালে বন্ধ। আমি অবশ্য তখন কলেজে। তারপর বাণীর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছি। গলির মোড়ে—ভাঙ্গা বাড়িটার কাছে শোভন আর সেজদা কথা বলছে। কেমন যেন সন্দেহ হল আমার। চুপি-চুপি শোভনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেজদা মাথা নীচু করে ছিল। শোভন হঠাৎ একটা অশ্লীল খিস্তি করল। পেটের কাছ থেকে কি একটা জিনিস টেনে বার করল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম শোভনের ওপর। লোকজন জমে গিয়েছিল। হৈ-হৈ, চিৎকার। মিটমাট হয়েছিল। দিদির আত্মহত্যা করাটা সহ্য করতে পারেনি বলেই মাথার ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি শোভনের পক্ষে।

আমি আর সেজদা বাড়ি চলে এসেছিলাম। একটাও কথা বলিনি আমরা দুজনে।

তারপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। হঠাৎ সেজদার ভাগ্য পরিবর্তন। সেও প্রায় ছ-সাত বছর হল। সেজদার যোগ্যতা প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু আমি জানি ও কত দুঃখী—আমার চেয়েও বড় দুঃখী ও।

ওর প্রতি মমতায়, হয়তো ভালবাসা অথবা ভাতৃস্নেহে বুকটা আমার ভরে উঠল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে সেজদার ডাকে ঘুম ভাঙল। মুখ চোখ ধুয়ে এলাম। বড় বউদি চা দিয়ে গেল।

সেজদা জিজ্ঞাসা করল, কিরে যাবি নাকি ?

বললাম, 'না, আজ কোথাও বেরুবো না।'

—'কেন চল-না, একটু ঘুরে আসি কোথাও। মনটা ভাল থাকবে।'

বললাম, 'মনটা খুবই ভাল আছে আমার। সব উত্তর পেয়ে গেছি।'

—'কিসের উত্তর ?' অবাক হল সেজদা।

—'ধাঁধাঁর।' হাসলাম আমি। 'অবশ্য তুমি জানতে।'

সেজদা হাঁ করে চেয়ে রইলো।

বললাম, 'আমার কারাবাস কেন হয়েছিল তুমি জানতে। আর…আর, সেই জন্যেই তুমি… ।'

—'কি, আমি কি ?' সেজদা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

হাসলাম। বললাম, 'হয় তো ভুল হয়েছে। অনেক ত্রুটি আছে আমার। আমি চেষ্টা করবো আমার ত্রুটিগুলো সংশোধনের।'

সেজদা বলল, 'তুই স্পষ্ট করে বল।'

বললাম, 'খুঁজে পেলে নিশ্চয়ই বলবো একদিন।'

—'কি খুঁজে পাবি ?'

—'পথ। সমস্ত মানুষ অথবা সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ অথবা ভারতবর্ষ, অথবা বলতে পার সমস্ত পৃথিবী ; আর পৃথিবী বলতে আমি বুঝি মানুষকে—সেই মানুষ যেমন, প্রতি ব্যক্তিই অনন্য এবং সে কারণে সমান মূল্যবান। প্রতি ব্যক্তিই সৃজনসামর্থ্যের অধিকারী; এই সামর্থ্যের সার্থকায়ণ সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্য। প্রতি ব্যক্তির বিকাশের ফলে সমগ্র মানব জাতির জীবন সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয় ; তাই সমাজের একমাত্র কর্তব্য হল ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ। চিন্তার স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা। যুক্তি একাধারে যেমন অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে জ্ঞানকে সম্ভবপর করে, অন্যধারে বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য এনে সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি, আইন-কানুনের উদ্ভাবন ঘটায়। ···সমাজের জন্যে ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্যেই সমাজ।··· আমার বিশ্বাস আমি নিশ্চয়ই একদিন পথ খুঁজে পাব এবং সেদিন···

সেজদা বলল, 'কি সেদিন ?

—'সেদিন আবার থেমে যাওয়া পৃথিবীটা চলতে সুরু করবে। ক্ষমতার নির্লজ্জ বেসাতি নিশ্চয়ই বন্ধ হবে। যদি বল তা কোন মতেই সম্ভব নয়, আমি বলব মিথ্যা—ভুল। কারণ আমি আশাবাদী। বিশেষ জ্ঞান—যাকে তোমরা বল বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞান যদি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে তাহলে মানুষের চৈতন্যময় সত্বা জেগে উঠে সত্য শিব ও সুন্দরের পথে যাত্রা করবে না ?

হয়তো উচ্ছ্বাস, অথবা আমার চিন্তার অসংলগ্নতা। আমি অনেক কিছুই ভাবছি এখন। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি আবার। যদিও আমার বুকের সেই জ্বালাটা এখনও আছে। তবু আমি শান্ত। ক্রমশ সহজ হচ্ছি।

সকালে বেরিয়েছিলাম একলা। বিকালে ফিরছি। সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি আছে। আষাঢ়ের শেষ। বর্ষা এবার আগে আসবে। ভাসবে কলকাতা। ভাসবে গ্রাম। ফসলের ক্ষতি। মানুষের দুর্গতির একশেষ। রিলিফের টাকায় কতজনের নতুন বাড়ি হবে। রাজ্যপালের বন্যাত্রাণ তহবিল খোলা হবে প্রতি বছরের মত। কি সুন্দর সুচরিত ব্যবস্থা। একটু এধার ওধার হবার উপায় নেই। যথারীতি নিয়মে বাঁধা। গ্রীষ্মে লোড সেডিং। বর্ষা এলেই ঘোষণা লোড সেডিং শেষ হচ্ছে। আবার হয়। নিয়মে বাঁধা।

হাঁটতে হচ্ছে আমাকে। বাস ট্রাম বন্ধ। কলকাতা ব-ন্-ধ যেন। অনেক গুজব শুনতে শুনতে এগুচ্ছি। নানা জনে নানা আলোচনা করছে। কোন যানবাহন চলছে না। কারণ মারামারি। অবশ্যই রাজনৈতিক। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই বন্ধ। প্রতিবাদ সরকারী পক্ষের কোন নেতাকে যদি পুলিশ ধরে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ। দেখলাম। শহর গ্রামের মানুষগুলোর কষ্টের কথা কেউ ভাবে না।

আসল ঘটনাটা শুনলাম প্রায় বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে। দোকান-পাট বন্ধ। শুনলাম মারামারির ঘটনা। একই দলের মারামারি। দুই গোষ্ঠিতে একজন মরেছে।

বাড়ী পৌঁছে দেখলাম বাণী এসেছে। ন'দার ঘরে গল্প করছে। সন্ধ্যা হচ্ছে। নিজের ঘরে চলে গেলাম।

জামা খুলছি, লনা চা নিয়ে এল। বলল, 'কিছু দেখলে ছোটকা?'

ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাণী এসেছে দেখলাম।'

—'না-না রাস্তায়?'

—'সব বন্ধ দেখলাম।'

—'কিছু শুনলে?'

বিছানায় বসে ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিলাম। বললাম, 'মারামারি হয়েছে শুনলাম। একজন মারাও গেছে নাকি?'

'না-না মারা যায়নি। পি জি.-তে নিয়ে গেছে। তবে অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। যাকে ছুরি মেরেছে তাকে তুমি চেন।'

'আমি চিনি?'

'হ্যাঁ, জেঠিমা বলছিল, এক সময় তোমার বন্ধু ছিল। শোভন চৌধুরী। এখন তো বেশ বড় লিডার হয়েছিল।'

কথাটা শুনে চুপ করে রইলাম। লনা চলে গেল। আমি ভাবছি।

কতক্ষণ বসে ছিলাম সেই ভাবে জানি না। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাণীর ডাকে মুখ তুললাম। ওর দিকে চাইলাম। বাণী দেখছে আমায়।

'আমি বাড়ি যাব, আমাকে একটু পৌঁছে দেবে?'

বাণীর সঙ্গে বেরুতে হল আবার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমরা হাঁটছি। পাশাপাশি। আমাদের সঙ্গে হাঁটছে আরো অসংখ্য মানুষ।

বাণীর কণ্ঠস্বরটা আমার কানে এল, 'আমি সব শুনেছি রুদ্র।'

আমি বাণীর দিকে চাইলাম। ও আমাকে দেখছে।

রাস্তায় ভিড়। ঘরেফেরা মানুষ। পাশাপাশি ঠিকমত চলা যাচ্ছে না বাণীর সঙ্গে। কখনো একটু এগিয়ে যাচ্ছে ও—কখনো আমি। একবার ও এগিয়ে পড়ল। ওর কাছে পৌঁছাতে ও দাঁড়িয়ে রইল। দেখলাম দিদিমনি-ব্যাগটা খুলে কিছু খুঁজছে। বললাম, 'দাঁড়ালে কেন, চল।'

—'একটু দাঁড়াও।' ভাল এক প্যাকেট সিগারেট বার করল বাণী। বলল, 'সেদিন এনেছিলাম তোমার জন্যে দিতে ভুলে গেছি। এই নাও।'

নিলাম। বাণীর উপহার! শোভনের কথা মনে পড়ল। শোভন আমার বন্ধু। খোঁজ নেব কাল। যদি বেঁচে থাকে এক দিন গিয়ে দেখে আসবো। আমার বিশ্বাস যদি ওর কাছে পৌঁছাতে পারি ফির চিনতে পারবে।

বাণী আমাকে স্পর্শ করল। বলল, 'কি ভাবছ, চল।'

আমরা এগিয়ে চললাম।

———